জানুয়ারি, ২০২২
wasef20

Al-Ameen Mission

Regd. Office: Khalatpur, Udaynarayanpur, Howrah, Ph.: 74790 20059
Central Office: 538 Elliot Road, Kolkata 700 016, Ph.: 74790 20076

SUCCESS AT A GLANCE : 2020

Dazzling Record in NEET (UG)

Marks 626 & above Within AIR 9908 **61**	Marks 600 & above Within AIR 20174 **134**	Marks 580 & above Within AIR 30431 **238**
Marks 565 & above Within AIR 39289 **322**	Marks 550 & above Within AIR 49260 **434**	Marks 536 & above Within AIR 59825 **516**

AIR 916 (675) Jisan Hossain

AIR 1276 (670) Tanbir Ahmed

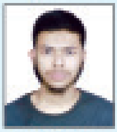
AIR 1522 (666) Md Samim

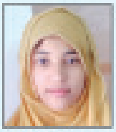
AIR 1982 (662) Ayesha Khatun

AIR 2298 (660) Al Taufeeq

AIR 2817 (656) Kanon Akhtar

AIR 2947 (655) Md Tarip Sk

Higher Secondary (12th) Examination

Board	Appeared		90%	80%	70%	60%
WBCHSE	Science	2090	909	1928	2072	2089
	Arts	79	43	66	78	79
CBSE	Science	54	8	24	43	54
	Total	2223	960	2018	2193	2222

Appeared 2223	
From Poor & BPL families	605 (27%)
From lower-middle income group	775 (35%)
From middle & upper middle income group	843 (38%)

81 students have occupied their positions within 20 ranks in the H.S. examinations of the Council

Secondary (10th) Examination

Board	Appeared		90%	80%	70%	60%
WBBSE	Boys & Girls	1706	461	1211	1557	1668
CBSE	Boys & Girls	71	21	48	64	70
	Total	1777	482	1259	1621	1738

Appeared 1777	
From Poor & BPL families	627 (35%)
From lower-middle income group	680 (38%)
From middle & upper middle income group	470 (27%)

15 students have occupied their positions within 20 ranks in 10th exam.

নূরন্নেছা খাতুন

রচনা সংগ্রহ

সংকলন ও সম্পাদনা

মীর রেজাউল করিম

মীর রেজাউল করিম কর্তৃক ৩৮, ডা. সুরেশ সরকার রোড,
পশ্চিম ব্লক (দ্বিতীয় তল), কলকাতা-৭০০০১৪ থেকে প্রকাশিত

মাসিক

উজ্জীবন

আলিয়া সংস্কৃতি সংসদ-এর মুখপত্র

জানুয়ারি ২০২২
কলকাতা

আলিয়া সংস্কৃতি সংসদ

সভাপতি : আমজাদ হোসেন

সম্পাদক : সাইফুল্লা

কোষাধ্যক্ষ: মীর রেজাউল করিম

উজ্জীবন

সম্পাদক : সাইফুল্লা

নির্বাহী সম্পাদক : জাহির আব্বাস

সম্পাদক মণ্ডলী : অনিকেত মহাপাত্র, আজিজুল হক, আবু রাইহান, আমিনুল ইসলাম, তৈমুর খান, পাতাউর জামান, ফারুক আহমেদ, মীজানুর রহমান, মুসা আলি, মুহম্মদ মতিউল্লাহ, শেখ হাফিজুর রহমান, সাজেদুল হক, সুজিতকুমার বিশ্বাস

উপদেষ্টা মণ্ডলী : আলিমুজ্জমান, খাজিম আহমেদ, জাহিরুল হাসান, মিলন দত্ত, মীরাতুন নাহার, রামকুমার মুখোপাধ্যায়, লোকমান হাকিম, সামশুল হক, স্বপন বসু

প্রচ্ছদ : ওয়াসেফুজ্জামান (**নাম-লিপি** : সম্বিত বসু)

বর্ণ সংস্থাপন : বর্ণায়ন

বিনিময় : ২৫ টাকা

যোগাযোগ : ৮৬৩৭০৮৬৪৬৯, ৯৪৩৩৬১১৬৩৭

ই মেল : ujjibanmag@gmail.com, aliahsanskriti@gmail.com

ই মেল এ লেখা পাঠান অথবা ব্যবহার করুন এই ঠিকানা :

মীর রেজাউল করিম, ৩৮ ডা. সুরেশ সরকার রোড, পশ্চিম ব্লক (তৃতীয় তল), কলকাতা-১৪

প্রাপ্তিস্থান : পাতিরাম, ধ্যানবিন্দু, নিউ লেখা প্রকাশনী, মল্লিক ব্রাদার্স, বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন

'উজ্জীবন' আলিয়া-র রূপান্তরিত রূপ

স ম্পা দ কী য়

ভালোবাসা। সব সমাধান করে মুহূর্তে। কী সমাধানযোগ্য আর কোনটা অসমাধেয়? যেখানে "বিকার" রয়েছে সামান্যও, তার মীমাংসা। নির্বিকার বলে হয় কি কিছু? আসলে ভালোবাসা কোথাও বিকৃতি দেখে না। তার সব সুন্দর। তার কাছে সুন্দর সবটুকু। ফুল তার কাছে ফুল তো বটেই, কাঁটাও তার কাছে ওই ফুলের সৌন্দর্যের বর্ধিত অংশ। যদি কাঁটা বিঁধে যায় হাতে? রক্তপতন হয় যদি? তাহলে? তাহলেও সেই রক্তে অসূয়া নেই, নেই সহিংসাত্মক মনোবেদনা। উপত্যকা-জোড়া ঘৃণা ও ঘৃণ্যতার ভেতর যে রূহ সচল রাখে জনজীবন তা-ই ভালোবাসা। এখন প্রশ্ন হল, ভালোবাসা কী ও কেন, কীভাবে ও কেমন, তা অনেকেই জানে, তারপরও কথা কেন এত? প্রেম কি কম পড়িয়াছে? পার্কে রেস্তোরাঁয় এত এত "প্রেম", হৃদয়-চিহ্ন ভরা ইমোটিকনরাজি, অপ্রতিশ্রুত সহবাস তারপরও? কোথাও কি বিপদঘন্টি বেজে চলেনি অজ্ঞাতসারে? মন জানে, মনই জানে। এমন কিছু স্তন্যপায়ী প্রাণী আছে যাদের জ্বর আসে ঘন ঘন। অসুস্থ হয়ে পড়ে। চিকিৎসার দরকার হয়। অথচ তারা নাচতে বাধ্য হয় জমায়েতে। আসরে। যে নাচে তার প্রাপ্য ব্যথা আর যে নাচায় তার পাওনা মুদ্রা, হাততালি, কেয়াবাত জনাব। ভালোবাসা এখন, হ্যাঁ এখনই, সেই প্রাণীটি। পড়ে থাকে বিবাহের প্রতিশ্রুতি, শয্যাসম্মতি, রতি-দরদ।

ভালোবাসাহীন মূল্যবোধের অস্তিত্ব আছে? যদি দেশকে ভালো না বাসা হয়, যদি দেশবাসীকে ভালোবাসা না হয়, যদি পৃথিবীর প্রতি না থাকে ভালোবাসা, মানুষের জন্য ভালোবাসা রাখা না থাকে যদি, তাহলে কেমন হয়? তাহলে প্রতিটি মানুষই হয়ে থাকে সুপ্ত ক্ষেপণ-উদগ্রীব সোরা, যাকে একটি চিত্র, একটি বাক্যের কণা বিস্ফারে নিয়ে যেতে পারে। শান্তি যেমন একটি মানসিক চুক্তি, ভালোবাসা তা কিন্তু নয়। এ স্বতঃপ্রণোদনাময়। এ আসে; ডেকে আনতে হয় না একে। ঘৃণা তাই ছড়ানো সহজ, কিন্তু ভালোবাসা? তাকে ছড়িয়ে দিলেই অঙ্কুরোদগম হয় না। এ জাগে; একে জাগাতে হয় না। তবে চাইলেই সে জাগে না, আসে না। তার জন্য আধারকে প্রস্তুত করে রাখতে হয়। আমাদের রাষ্ট্র কি প্রস্তুত? ভালোবাসার এত এত ঐতিহ্য নাকি আমাদের ইতিহাসে।

তাহলে কেন 'ধর্ম' পরিচয়ের নিরিখে কোতল হয়ে যায় কেউ? 'লিঙ্গ' পরিচয়ে বলাৎকার হয়ে যায় কেন একজন? 'বিত্ত' পরিচয়ে বিচ্ছিন্নতা বোধে রোজ আরও প্রান্তিক হয়ে ওঠে কেন কেউ? আমাদের ইতিহাসে ইসলামি শাসনই তো কেবল রক্তপাতের কথা বলে, এ অন্ধকার। আর কোথাও, কোনোখানে লাল চোখ, রক্ত নেই তো? বাকি সবটুকু কেবলই আলো আর আলো তো? তাদের আগে ও পরে? অতিথি আমাদের ঈশ্বর-সমগোত্রজ। এ-ই তো ভালোবাসা। এখন আঘাতের আগে প্রশ্ন করে নেওয়া হয় নিশ্চয়ই, কে অতিথি আর কে অনুপ্রবেশকারী। এই সুচিন্তিত ভালোবাসা, এই সু-নির্দিষ্ট ভালোবাসা, এই সু-বিশেষ ভালোবাসা বড় বিপদ-জনক।

অ-সভ্যেরা প্রেম বলতে বোঝে শরীর। সেখানে 'কুসুম'-এর মন নাই। সভ্য মানুষ প্রেম বলতে কয়েকটি প্রশ্ন বোঝে, কাকে প্রেম, তার আধারসম্বলিত পরিচয় পত্র কোথায়, কতদূর প্রেম, কেনই বা প্রেম? এ প্রেম নির্বাচিত। এ প্রেম রেজিমেন্টেড। সে শুধু শরীর নয়, বোঝে পূর্ণত ও নিঃশর্ত অধিকার। এই প্রেম যেহেতু অভিনয়কলার নিকটবর্তী, তাই এই প্রেম বিজ্ঞাপনের। এই প্রেমে নেই প্রেম, বিবাহ, দায়বোধ: যা আছে তা হল সহবাস ও প্রতিশ্রুতি। যদিও বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস বিষয়টি সোনার পাথরবাটির মতো। একজন নিজেকে 'ভোগ্য পণ্য' ভাবছে শুরুতেই। বিনিময় মূল্য কী? না যৌনসম্মতি। তাছাড়া, তাকে কে বলে দিয়েছে যে একজনের সঙ্গে যৌনতা করলে অন্য কাউকে বিয়ের অধিকার সে হারিয়ে ফেলে? কুমারীত্বকে কি সে মূলধন ভাবে নাকি? এখানে আরেকটি তর্ক রয়েছে। যে-লোক, যে-সমাজ, যে-রাষ্ট্র প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, তার সঙ্গে সহাবস্থান করবে কীভাবে একজন? সে তো প্রত্যাখ্যানেরই যোগ্য।

আমাদের প্রেমিকসত্তাটিকে আত্মপ্রেমে মগ্ন করে রেখেছি আমরা। সে যত নিজেকে ভালোবাসতে যাচ্ছে ততই সে বিবিধের কাছে ঘৃণ্য হয়ে উঠছে অগোচরে। সে যতই নিজের মধ্যে ডুব দিতে যায় ততই তার বিপুল তুচ্ছতা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। মুশকিল হল, এই স্ব-প্রেমীটি নির্লোভী নয়। তার একটা ভাবমূর্তির প্রশ্ন আছে। সে রাতের গোপনে বৃক্ষ-হন্তারক আর দিনের প্রকাশ্যে বৃক্ষপ্রেমী সেজে থাকতে চায়। সে প্রকাশ্যে নিরামিষাশী আর গোপনে মাংস ছাড়া কিছু গ্রহণ করে না। এরাও ভালোবাসে কাউকে, ঘৃণাও করে এরা কাউকে। এই ঘেন্না ও ভালোবাসার রূপ কিন্তু সরল একরৈখিক নয়। এরাই সাম্প্রতিকে নেতৃত্বে। এরাই এখন পথপ্রদর্শক। এরাই নৈয়ায়িক। ফলত সমস্ত "ন্যায়", সব "পথ" এখন বিপদসঙ্কুল; অন্ধকার বিপথগামী।

সংস্কৃতি। রাকিব। ৭

কৃতিকথা। অর্পণ পাল। ১৭

ইতিহাস। মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম। ২৬

ব্যক্তিত্ব। রমজান আলি। ৩৮

কবিতা। ৪১

মুহাম্মাদ ওলিদ সাঁফুই, মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ হেলালী, সুব্রত ভট্টাচার্য, আজিবুল সেখ, মাহিরুল ইসলাম, নিজামউদ্দিন মণ্ডল, মুস্তারী বেগম, আজহারুল হক, নজর-উল-ইসলাম

উপন্যাস। মেকাইল রহমান। ৪৭

গল্প। পাতাউর জামান। ৬০

বঙ্গ-দর্পণ।

বিকাশকান্তি মিদ্যা। ৬৯

আব্দুল বারী । ৭৪

ভ্রামণিক। শবনম জামান। ৮৪

সংসদ-সংবাদ। ৮৭

নিবেদন

আমরা আকাঙ্ক্ষা করি উজ্জীবন এর দর্পণে বিশেষ রূপে প্রতিবিম্বিত হক আঞ্চলিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি। বাংলার গ্রাম-গঞ্জের, এক একটি অঞ্চলের রয়েছে নিজস্ব সব ইতিহাস, ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্যের খনন ও নিষ্কাশন আমরা আমাদের পবিত্র কর্তব্য বলে জ্ঞান করছি। এ প্রেক্ষিতে প্রাজ্ঞসমাজের অনুগ্রহ কামনা করি।

[অনিবার্য কারণে অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর-২০২১ সংখ্যা প্রকাশিত হয়নি]

রাকিব

‘মুসলমানি বাংলা প্রাইমার’ : প্রয়োজনীয়তা ও প্রাসঙ্গিকতা

শিশুর ভাষা শিক্ষার প্রারম্ভিক পাঠ্য পুস্তক হল ‘প্রাইমার’। বাংলা ভাষায় প্রাইমার রচনার ‘শুরুয়াত’ শ্রীরামপুর মিশনের হাত ধরে। তারাই প্রথম বাংলা ভাষা শিক্ষার জন্য প্রাইমারের প্রচলন করেন। ১৮১৬ সালে শ্রীরামপুর মিশন কর্তৃক রচিত ‘লিপিধারা’ হল প্রথম বাংলা প্রাইমার। সমকালীন সময়ে শিশুর শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন স্কুল বা পাঠশালাগুলির নিজস্ব প্রাইমার ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বসুর লেখা ‘শব্দসার’ (১৮৩৫) হল প্রথম বাঙালি লিখিত বাংলা প্রাইমার। অন্যদিকে বাঙালি মুসলমান লেখক রচিত প্রথম বাংলা প্রাইমার হল মহ. জুহুরুদ্দিন প্রণীত ‘জ্ঞানশিক্ষা-১’ (১৮৬৯)। উপরে উল্লেখিত প্রাইমারগুলির নামকরণে (‘লিপিমালা’, ‘শব্দসার’, ‘জ্ঞানশিক্ষা-১’) ধর্মীয় কোনো ভাব পরিস্ফুট না হলেও বাংলা প্রাইমারের বাজারে ধর্মীয় অনুষঙ্গের বিষয়টি ঢুকে গিয়েছিল এর পর থেকেই। ‘মুসলমানি’ বা ‘ইসলামি বাংলা প্রাইমার’ নামে সেই যাত্রাপথ শুরু হলেও তার অন্তরালে ছিল এক গভীর সমাজ-মনস্তত্ত্বের বোধ; যা আজও ইসলামি বাংলা প্রাইমার রচনার খোরাক যুগিয়ে চলেছে। বাঙালি মুসলমান শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা দিতে জন্ম হয়েছিল মুসলমানি বাংলা প্রাইমারের। ভাষা শিক্ষার এই ধারায়, বাঙালি মুসলমানের কাছে, ধর্মীয় প্রলেপের প্রয়োজন কেন হল, তা জানতে হলে ফিরে তাকাতে হবে উনিশ শতকের শেষ লগ্নে। বাঙালি মুসলমানের সামনে উপস্থিত হওয়া আত্মপরিচয়ের সংকট যখন দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পরিসর তৈরি করে দিয়েছিল, সেই সংকটের কালেই মুসলমানি বাংলা প্রাইমারগুলির উৎপত্তি।

প্রাক্ ব্রিটিশ যুগে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল, মাদ্রাসা-মক্তব-টোল কেন্দ্রিক। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে ইসলামি আইন-কানুন সম্বলিত ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়াও, দর্শন, গণিত, অধিবিদ্যা, ব্যাকরণ ও অলংকার শাস্ত্র, ভাষা শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হত। আঠারো শতাব্দীর শেষ থেকেই বাংলা তথা ভারতের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক

ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আসতে শুরু করে। শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রেও সেই পরিবর্তনের ঢেউ এসে পড়ে। মূলত আরবি-ফারসি ভাষাশিক্ষার উদ্দেশ্যে কোম্পানির ছত্রছায়ায় কলকাতায় তৈরি হয় কলকাতা মাদ্রাসা (১৭৮০ খ্রিস্টাব্দ)। এযাবৎকালের পৃষ্ঠপোষকতা জনিত মাদ্রাসাগুলির পরিবর্তে কোম্পানি প্রবর্তিত এই প্রতিষ্ঠান জাতে-গোষ্ঠীতে যে আলাদা তা বলা বাহুল্য। কোম্পানির উপযোগবাদী শিক্ষা ব্যবস্থার শুরু এখান থেকেই। কোম্পানির শাসন যন্ত্রের ভাষা হিসেবে ফারসি অব্যাহত থাকায়, কোম্পানির দরবারে ফারসি জানা কর্মীর প্রয়োজন ছিল। সেই প্রয়োজনের তাগিদেই উপযোগবাদী শিক্ষা ব্যবস্থার ধারায় কলকাতা মাদ্রাসার জন্মলাভ। এই ব্যবস্থার ফলে ক্ষয়-ক্ষতি, লাভ-লোকসানের খতিয়ান এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। তবে একথা স্বীকার্য যে, এর ফলে আরবি-ফারসি ভাষাজ্ঞান সম্বলিত মুসলমানের সামনে কেরানি রূপ চাকরির বাঁধা বন্দোবস্ত একটা হয়েছিল। যেই মুহূর্তে প্রতিবেশী হিন্দু সমাজ ইংরাজি ভাষা শিক্ষা এবং পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার দ্বারা নিজেদের সার্বিক উন্নতির দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন মুসলমান ছাত্র সমাজ কলকাতা মাদ্রাসায় ইংরাজি শিক্ষা তুলে দেওয়ার পক্ষে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন। অবক্ষয়িত মাদ্রাসা ব্যবস্থার চর্বিত চর্বণ গলার্ধঃকরণ করেই তারা পরলৌকিক মুক্তিলাভের আশায় মশগুল ছিলেন। তবে, এই অবস্থা খুব বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। ১৮৩৫ সালের মেকলে মিনিট এবং ১৮৩৭ সাল থেকে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ইংরাজি ভাষা বলবৎ হওয়ার কারণে ফারসি শিক্ষিত বাঙালি মুসলমানের কেরানির চাকরি হাতছাড়া হল। সেই সঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষার জ্ঞানালোকের দিকটিও ক্রমশ ক্ষীণ হতে থাকল।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙালি মুসলমানের শিক্ষাদীক্ষার ইতিবৃত্তটি কতকটা এই ছাঁচেই ভাঙাচোরা রূপ পেতে থাকে। অর্থাৎ, একদিকে সমাজের নিম্নস্তরে অবস্থানকারী মুসলমান সমাজের সামনে কম খরচের মাদ্রাসা শিক্ষার প্রচলন ছিল বেশি। সেখানে তাদের সামনে ইহলৌকিক ও পরলৌকিক জগতের প্রয়োজনীয় সূত্রগুলি সহজলভ্য ছিল। অন্যদিকে, অভিজাত মুসলমান সমাজে নিজেদের আভিজাত্যয়ানার গরিমা প্রদর্শনের ফলে, অর্থনৈতিক ক্রমপরিণতির ফলে এবং ইংরাজি বিমুখ শিক্ষা ব্যবস্থায় আস্থা রাখার ফলে, ক্রম অবনতির পথে চলে যায়। ওয়াকিল আহমেদ তাঁর 'বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবী' গ্রন্থে দেখিয়েছেন, বাঙালি মুসলমানের মধ্যে স্পষ্ট দুটি শ্রেণি কীভাবে একে অপরের থেকে শত যোজন দূরে অবস্থান করত। আশরাফ নামে পরিচিত এই শ্রেণি আসলে নিজেদের আত্মগরিমার কারণে এবং ইংরেজি বিদ্বেষী মনোভাবের কারণে নিজেদের সার্বিক উন্নতি থেকে সরিয়ে রেখেছিল। অন্যদিকে কোম্পানির সরকারের নিত্যনতুন নিয়ম-ব্যবস্থার কারণে, কুটির শিল্প ধ্বংস, কৃষি ব্যবস্থার ক্রমঅবনতি ইত্যাদির কারণে নিম্নবর্গীয় মুসলমান শ্রেণির অবস্থাও অন্ধকারে নিমজ্জিত হচ্ছিল। অভিজাত

শ্রেণির কোনো মুসলমান প্রতিনিধি হাল ধরতে এগিয়ে আসেননি। এই পরিস্থিতিতে মুসলমান সমাজের উভয় শ্রেণির সামনেই শিক্ষার দিকটি উপেক্ষিত হয়েছিল।

মুসলিমদের এই আধুনিক ইংরেজি শিক্ষা থেকে দূরে সরে থাকার পেছনে কিছু কারণ রয়েছে। তা নিয়ে বিভিন্ন গবেষক, বুদ্ধিজীবী বিস্তর আলোচনাও করেছেন। তবে আমরা এই আলোচনার প্রয়োজনে মুসলিম সমাজের নিজেদের শেকড়ের প্রতি টান, বিদ্বেষী মনোভাব ও অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতার প্রতি সামান্য দৃষ্টিপাত করব। ইসলাম ধর্মে সাম্যবাদ ও সৌভ্রাতৃত্বের নীতির কথা প্রচার করা হলেও, বাংলায় যেখানে নিম্নবর্গীয় এবং নিম্নবর্গীয় ধর্মান্তরিত মুসলমানের সংখ্যা বেশি সেখানে উচ্চবিত্ত এবং নিম্নবিত্তের ভাগটি স্পষ্টই ছিল। মুঘল বা নবাবি আমলে প্রশাসনিক কাজের সঙ্গে যুক্ত উচ্চবর্গের মুসলমানদের সঙ্গে নিম্নবর্গের মুসলমানদের কোন আত্মিক যোগ ছিল না। উনিশ শতকের প্রায় চার দশক ধরে চলা ওয়াহাবি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এই উভয় শ্রেণির মধ্যে একটি স্বার্থান্বেষী সংযোগ তৈরি হয় বটে, তবে ধর্মীয় আবেগের কোনো স্পর্শ তাতে ছিল না। শেখ-সৈয়দ-মুঘল-পাঠান বংশোদ্ভুত আশরাফ শ্রেণির সঙ্গে কৃষক-তাঁতি-মাঝি-মল্লার অর্থাৎ আতরাফ শ্রেণির মধ্যে একটা ধর্মীয় সংযোগের পরিস্থিতি তৈরি হয় উনিশ শতকের আটের দশকে। প্যানইসলামের প্রভাবে এদেশের মানুষদের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বের প্রচার ও প্রসার ঘটানো হয়।

তবে এইসব প্রচারের ফাঁকে মুসলমান সমাজে শিক্ষার বিষয়টি ব্রাত্যই থেকে যায়। নিম্নবর্গীয় শ্রেণির কাছে যেমন ব্যয়বহুল ইংরাজি শিক্ষা গ্রহণ সম্ভবপর ছিল না, তারা সাধ্যের মধ্যে পাওয়া মাদ্রাসা শিক্ষার অনুগ্রাহী ছিলেন, অন্যদিকে ইংরেজ বিদ্বেষের কারণে উচ্চবিত্ত শ্রেণির কাছে ইংরাজি শিক্ষা গ্রহণীয় হয়নি। ফলে আরবি-ফারসির চর্চিতচর্বণ শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়েই মুসলমান সমাজ মগ্ন থাকলেন। সেই সঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষার মানও ক্রম অধঃপতনের মধ্য দিয়ে কোনক্রমে টিকে ছিল। আত্মমগ্ন মুসলমান সমাজ তার সার্বিক উন্নয়নে কোনো আগ্রহ দেখায়নি। এর পরেও যে সমস্ত মুসলমান আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে চাইতেন, তাদের 'পঞ্চভাষা' (বাংলা, আরবি, ফারসি, উর্দু এবং ইংরেজি) শিখিতে হত। সেখানে হিন্দুদিগের ২ বা ৩ টি ভাষা শিখলেই চলত, সেখানে মুসলমান ছাত্রকে পাঁচটি ভাষা শিখতে হত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রথম মুসলিম সম্পাদিত সাময়িক পত্রিকা 'সংবাদ সভারাজেন্দ্র' (প্রথম প্রকাশ- ১৮৩১; সম্পা- আলীমুল্লাহ) প্রকাশিত হত এই পাঁচটি ভাষায়। মাতৃভাষা রূপে বাংলা (অবশ্যই, মুসলমানি বাংলা), ধর্মীয় ভাষা হিসেবে আরবি, মুসলমানদিগের জাতীয় সাহিত্য, আদব-কায়দার শিক্ষা, নীতিগত মূল্যবোধ, ইতিহাস জানতে ফারসি ভাষা, ভারতীয় মুসলমানদের জাতীয় ভাষা রূপে পরিগণিত উর্দু ভাষা এবং চাকরির প্রয়োজনে ইংরেজি ভাষা শেখার আবশ্যকতা ছিল। পঞ্চভাষার জটিলতা, মুসলমান সমাজের আধুনিক শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে

নেওয়ার একটা অন্যতম কারণ। ফল স্বরূপ, মুসলমান সমাজ অর্থনৈতিক এবং শিক্ষাগত দিক থেকে ক্রমশ দুর্বল হতে থাকে। অবশ্য রাজভাষার পরিবর্তনকে বদরুদ্দীন উমর শাসকগোষ্ঠীর সাথে কলকাতার ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্তের এক ষড়যন্ত্র হিসেবে দেখেছেন। মুসলিমদের এই আধুনিক ইংরেজি শিক্ষা থেকে দূরে সরে থাকার পেছনে তাদের হিন্দু ও ইংরেজ বিদ্বেষী মনোভার ভীষণভাবে কাজ করেছে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাঙালি মুসলমানের মধ্যে যখন ইংরেজ বিদ্বেষের ভাব কমে আসতে শুরু করে, তখন শিক্ষা গ্রহণের প্রতি তাঁদের মধ্যে চাহিদা তৈরি হয়। কিন্তু বাংলা এবং ইংরাজি মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে এক নতুন অন্তরায়ের সম্মুখীন হতে হল। শিক্ষার অঙ্গনে মুসলমানি বাংলা পাঠের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। শিশু শিক্ষার্থীদের সামনে ইসলামি ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের কোনো প্রদর্শন ছিল না। বাঙালি মুসলমানের সামনে তৈরি হল আর এক গড়ার ক্ষেত্র। শিশুর মধ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নীতিবোধের পাঠ প্রদান করতে প্রচলিত পাঠ্যপুস্তকগুলিতে এবং প্রাইমারগুলিতে ইসলামি আদর্শের প্রবেশ ঘটাতেই ইসলামি বাংলা প্রাইমারের সৃষ্টি। আসলে নীতিশিক্ষার দ্বারা মানুষের চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উপাদান ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত, কর্তব্য-অকর্তব্য ইত্যাদির পাঠ শেখানো যায়। আর এক্ষেত্রে শিশুদের পাঠ্যপুস্তকে, বিশেষ করে শিশুদের জন্য রচিত প্রারম্ভিক পাঠ্যপুস্তকগুলির মাধ্যমে তার পাঠ দেবার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। কেননা, একটি শিশু তার শৈশবে যা শেখে-দেখে-জানে, তা তার ক্রমবর্ধমান ও বিবর্তনমান জীবনে আদর্শ গঠনে সহায়তা করে এবং শিশুরা সেই আদর্শের পথ ধরে জীবন অতিবাহিত করতে থাকে।

বাঙালি মুসলমানের কাছে বাংলা চর্চার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল। কিন্তু শিশুকে বাংলা ভাষা শিক্ষা দিতে গেলে বইয়ের প্রয়োজন। আমাদের মনে হতে পারে ‘বর্ণপরিচয়’ (১৮৫৫), ‘শিশুশিক্ষা’ (১৮৪৯), ‘হাসিখুশি’ (১৮৯৭)—এই বইগুলো তো রয়েছে। তাহলে সমস্যা কোথায়? সমস্যা হল, ধর্মীয় মানসিকতার। মুসলমান শিশু যে বাংলা পড়বে তা ‘মুসলমান বাংলা’ অর্থাৎ সেখানে আরবি-ফারসি ভাষার ঝলক থাকবে, নবি-রসুলদের নাম থাকবে, কোরান-হাদিসের প্রসঙ্গ থাকবে। তবেই না মুসলমানের বাংলা পড়া সম্পূর্ণ হবে! শুরু হল, বাঙালি মুসলমান শিশুর জন্য ‘ইসলামি বাংলা প্রাইমার’ রচনা।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১৮৮১ সালে ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকায় ‘বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা’ প্রবন্ধে বলেছিলেন “বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, যাহা আছে, তাহা ইতিহাস নয়, তাহা কতক উপন্যাস, কতক বাঙ্গালার বিদেশী বিধর্মী অসার পরপীড়কদিগের জীবনচরিতমাত্র। বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে।” বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার ইতিহাসের জন্য

আক্ষেপ করেছিলেন সত্যি ইতিহাস নাই, ইতিহাস লিখতে হবে। এই সংকটে আমরা সকলে বোধ হয় ইতিহাস রচনাতে কোমর বেঁধে নেমে পড়িনি। তবে কেউ কেউ

ইসলামি সহজ পাঠ

ইতিহাস রচনায় হাত জুগিয়েছেন, তা বলার অবকাশ রাখে না। আর ঠিক এই রকমই সংকট বাংলায় বসবাসকারী মুসলমানদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল; তাঁরা 'মুসলমান বাঙালি' না 'বাঙালি মুসলমান' অর্থাৎ 'আত্মপরিচয়ের সংকট'। এবং ঠিক এই সংকটের পরিস্থিতিতে বাঙালি মুসলমান উপলব্ধি করেছিলেন, নিজের বাড়ির শিশুর পড়ার জন্য শিশুতোষ

কোনো পাঠ নেই। এই সংকট পরিস্থিতিতে শিশুতোষ পাঠ্যপুস্তক নেই এমন উপলব্ধির কারণ কি? আর কেনই বা এমন সব শিশুতোষ পাঠ্যপুস্তক থাকা সত্ত্বেও 'মুসলমানি' শিশুতোষ পাঠ্যপুস্তক আমরা যাকে 'প্রাইমার' নামে অভিহিত করে থাকি, তা রচনার প্রয়োজন হল? কেন এই সংকট? এমন সংকটের কথা, আক্ষেপের কথা শুনতে পাই, মীর মশাররফ হোসেন রচিত আত্মজীবনী 'আমার জীবন' গ্রন্থে। সেখানে তিনি উল্লেখ করছেন—"আমরা দুই ভাই কুষ্টিয়া স্কুলে ভর্তি হইলাম, ইংরেজী আর বাঙ্গলা পড়িতে হয়।" তিনি আরো উল্লেখ করেছেন—"এতদিন পড়িলাম আল্লা রসুলের নাম কোনো স্থানে পাইলাম না। কাহারও মুখে শুনিলাম না। যিনি গুরু তাঁহার মুখেও না, বরং ইংরেজী কেতাব মধ্যে কয়েক জায়গায় শূকরের নাম পাইলাম। তিনের পাকসাফ্ পবিত্রতার নাম গন্ধ পাইলাম না।...আল্লাহ্ রসুলের নাম কেতাবে নাই কিন্তু রাম শ্যাম হরি কালী, দূর্গা বানর শূকর কুকুর শৃগালের নাম অনেক স্থানে পাইলাম।"

আসলে বাঙালি মুসলমানের মধ্যে যখন শিক্ষা এবং মননের চর্চা শুরু হল তখন আরবি-ফার্সি-উর্দু ও বাংলা ভাষায় বিস্তর ধর্মচর্চা করলেও নিজের বাড়ির শিশুর পড়ার জন্য শিশুতোষ কোনো পাঠ সে তাঁর সন্তানের হাতে তুলে দিতে পারেনি। মীর মশাররফ হোসেন বাল্যকালের স্মৃতি মনের মধ্যে পোষণ করেছিলেন। তাই এই 'সংকট', 'সর্বনাশ' থেকে মুসলমান সমাজকে বাঁচাতে শিশুতোষ প্রাইমার রচনায় হাত লাগিয়েছেন। রচনা করলেন 'মুসলমানের বাঙ্গলা শিক্ষা প্রথম ভাগ' (১৯০৩) ও 'মুসলমানের বাঙ্গলা শিক্ষা প্রথম ভাগের প্রথম অংশ' (১৯০৭)। মীর মশাররফ হোসেনের মতো এই সংকট অনুভব করেছিলেন তৎকালীন বাঙালি মুসলমান পণ্ডিতগণ। কীভাবে, প্রতিনিয়ত বাংলা পাঠ্যপুস্তকগুলিতে নিহত হচ্ছে বাঙালি মুসলমানের ইসলামী চেতনা। সেই প্রসঙ্গে, মোহাম্মদ ফকির উদ্দীন সরকার 'বাসনা' পত্রিকায় (২য় ভাগ, ২য় সংখ্যা; জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬) 'ছাত্রজীবনে নৈতিক শিক্ষা' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন— "আজকাল বিদ্যালয়াদিতে যে সকল সাহিত্য ও ঐতিহাসিক পুস্তকাদি পঠিত হইতেছে, তাহা হিন্দুর দেবদেবী, মুণি-ঋষি, সাধু-সন্নাসী, রাজা-মহারাজা, বীর-বীরাঙ্গানা ইত্যাদির উপাখ্যান ও জীবনচরিত আদিতেই পরিপূর্ণ, হিন্দুর ধর্ম-কর্ম, ব্রত-অর্চনা, আচার-ব্যবহার ইত্যাদির মাহাত্ম্য বর্ণনাতেই সেই সব পাঠ্যগ্রন্থ অলঙ্কৃত। মুসলমানের পায়গাম্বর-পীর, অলি-দরবেশ, নবাব-বাদশাহ, পণ্ডিত-ব্যবস্থাপক, বীর-বীরাঙ্গনা আদির উপাখ্যান বা জীবন-বৃত্তান্ত অথবা ইসলামের নিত্য-কর্তব্য ধর্মাধর্ম, ব্রত-উপাসনা, খয়রাত-জাকাত ইত্যাদির মাহাত্ম্যরাজির নামগন্ধও ঐ সকল পুস্তকে নাই, বরঞ্চ মুসলমান ধর্মের ও ধার্মিকদের প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষের ভাবই বর্ণিত আছে।"

এই পরিস্থিতিতে প্রথমে চাই মুসলমান বালক বালিকাদিগের পাঠ্যপুস্তক। ইসলামি শিশুতোষ বাংলা পাঠ্যপুস্তকের এমনই সংকট অবস্থা এবং এতটাই গুরুতর ছিল যে

মাদ্রাসাতে ‘হিন্দু লেখকদের’ লেখা বই পড়ানো হত। এমনই কিছু কথা, মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ ‘আল-এসলাম’ (২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা; জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩) পত্রিকায় ‘আমাদের (সাহিত্যিক) দারিদ্রতা’ নামক প্রবন্ধে লিখেছিলেন—“মকতবে ও মুসলমান বালিকা বিদ্যালয়েও আমাদিগের শিশুগণকে হিন্দুর লিখিত পুস্তক পড়িতে হয়, এতদপেক্ষা আর কি কলঙ্কের কথা আছে? আমরা কি এতই মূর্খ যে, তাহাদের জন্য পুস্তক রচনা করিতে পারি না?”

এমন সংকটের মুহূর্তে মুসলমান বুদ্ধিজীবী, পণ্ডিতগণ, মুসলমান লেখকগণ বাংলার মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার উদ্দেশ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা অর্থাৎ ইংরেজি শিক্ষার পাশাপাশি মাতৃভাষায় শিক্ষা দেবার প্রয়োজন বোধ করেন। এমনকি, শিশুদের জন্যও বাংলা ভাষা শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় রীতি-নীতি ও মূল্যবোধের পাঠ প্রদান করতে প্রাইমার রচনায় প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। আর তাঁরা এর সঙ্গে যোগ করেন ধর্মীয় শিক্ষার পাঠে আরবি-ফারসি-উর্দু ভাষায় প্রসঙ্গ, শব্দ ভাণ্ডার ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গ থেকে শিশুদের জন্য রচিত প্রারম্ভিক পাঠ্যপুস্তক বা প্রাইমারও বাদ যায়নি।

আমরা জানি, উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বাঙালি মুসলমানের 'আত্মপরিচয়'-র সংকটের কাল শুরু হয়ে যায়। আর, এই সময় থেকেই শুরু হয় 'ইসলামি বাংলা প্রাইমার' রচনা। আশিস খাস্তগীর তাঁর 'বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ (১৮১৬-১৮৫৫)' গ্রন্থে দশজন মুসলমান প্রাইমার রচয়িতা ও তাঁদের রচিত প্রাইমারের নাম উল্লেখ করেছেন। যথা—১। মহ. জুহুরুদ্দিন (জ্ঞানশিক্ষা-১, ১৮৬৯), ২। মুন্‌সি কাজিমুদ্দিন (প্রথমশিক্ষা, ১৮৮৫), ৩। মজহরুল্লা কাজি (প্রথম ভাগ বর্ণবোধ, ২য় সং ১৮৮৬), ৪। মহঃ আবদুল মজিদ সরদার (বর্ণশিক্ষা প্রথম ভাগ, ১৮৮৮), ৫। ফতে মণ্ডল (অক্ষর পরিচয়-১, ১৮৮৮; অক্ষর পরিচয়-২, ১৮৮৯), ৬। ওয়াজুদ্দিন আহমেদ (সরল শিক্ষা, ১৮৮৯), ৭। রহিমুদ্দিন সরকার (নব বর্ণপরিচয়, ১৮৮৯), ৮। মালেকউদ্দিন আহমেদ (নব শিশুশিক্ষা, ১৮৯৩), ৯। মুন্‌সি জমারত হুসেন (সচিত্র শিশুশিক্ষা-১/২, ১৮৯৭) এবং ১০। অর্পণ-উল-মুন্‌সি (নব বর্ণশিক্ষা, ১৮৯৭)। বিশ শতকেও এমন বহু শিশুপাঠ্য পুস্তক রচিত হয়েছে। আর বর্তমানকালেও এমন শিশুপাঠ্য পুস্তক রচনা হয়েছে বা হচ্ছে।

ইসলামি বাংলা প্রাইমার রচনার উদ্দেশ্যর দিকে লক্ষ রাখলে যে বিষয়গুলি নজরে আসে, তা হল মুসলমান বাঙালিদের কাছে বাড়ির শিশুকে শিক্ষা দেবার জন্য কোনো শিশুতোষ বাংলা পাঠ্য প্রারম্ভিক পুস্তক বা প্রাইমার ছিল না। সমকালীন সময়ের প্রেক্ষাপটে ইসলামি বাংলা প্রাইমার রচনা করা জরুরি হয়ে উঠেছিল। আর এই প্রাইমার রচনার মধ্যে দিয়ে যে উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে তা হল বাড়ির শিশুকে ভাষা শিক্ষার পাঠ দেওয়া। পাশাপাশি ধর্মীয় রীতি-নীতি শিক্ষা দেওয়া। প্রচলিত বাংলা প্রাইমারগুলিতেও ভাষা শিক্ষার পাঠ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাঁদের মতে (মুসলমান প্রাইমার রচয়িতাদের) সেখানে বাংলা সংস্কৃতির পাশাপাশি অমুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় রীতি-নীতির কথা, আচার আচরণের কথা, ধর্মীয় নানা অনুষঙ্গ, এমনকি ধর্মীয় শব্দ (যা মূলত সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত এবং তা ধর্মীয় রীতি-নীতি বোঝানোর জন্যই ব্যবহৃত হয়) হয়তো বাস্তবিক জীবনে সেগুলির প্রয়োগের কোনো দিক ছিল না, বা বলা ভালো দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত হত না। এদিকে বাংলার আর এক প্রতিবেশি সম্প্রদায় মুসলমানের

ধর্মীয় শব্দ যা তাদের ব্যবহারিক জীবনে বাংলা ভাষার পাশাপাশি সমান্তরালভাবে মুসলমান সমাজে প্রচলিত আছে, সেগুলি প্রচলিত বাংলা প্রাইমারে ব্যবহার হতে দেখা যায়নি। এতে মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের মনে হয়েছিল এর ফলে বাড়ির শিশুরা তো 'হিন্দু'

শব্দ শিখছে, কিন্তু কিছু 'মুসলমান' শব্দ যা তাঁদের (মুসলমানদের) দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত হয়ে আসছে, তা তারা (মুসলমান শিক্ষার্থীরা) শিখছে না বা তারা যে শব্দগুলি

জানত সেগুলিও ভুলতে বসেছে। ফলে বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাসে বা ব্যাপকভাবে বললে বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে যে বিপুল পরিমাণ ইসলামি শব্দ আছে, সেগুলি হারিয়ে যেতে বসেছে। এবং সেগুলির হারিয়ে যাওয়ার প্রকট সম্ভাবনা-সংকট ইসলামি বাংলা প্রাইমার রচয়িতাদের মনে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। বলা যেতে পারে, সেই সম্ভাবনা ও সংকটের জায়গা থেকে ইসলামি প্রাইমার রচয়িতারাও ইসলামি বাংলা প্রাইমারে ইসলামি শব্দ ব্যবহারে প্রায়োগিক দিকগুলিকে শিশুর মধ্যে দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন। অন্যদিকে, প্রচলিত বাংলা প্রাইমারের বাংলা সংস্কৃতি তথা ভাষার শব্দভাণ্ডারে ইসলামি শব্দের যে বিপুল ভাণ্ডার রয়েছে, সেগুলি থেকেও অমুসলিম সম্প্রদায়ের শিশু শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হয়েছে। এতে, ১. মুসলমান শিক্ষার্থীরা ইসলামি শব্দ শিখছে না। যেগুলি পারিবারিক সূত্রে জানত, সেগুলির প্রায়োগিক দিক না থাকার ফলে ভুলতে বসেছে। ২. অমুসলিম সম্প্রদায়ের শিশু শিক্ষার্থীরা ইসলামি শব্দ ভাণ্ডারের বিপুল ভাণ্ডার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে, প্রাইমার যে ভাষা শিক্ষার একটি উপাদান/আয়ুধ (tools) যা ভাষাশিক্ষার পাশাপাশি ভাষার মধ্যে অবস্থিত ভাষার সাংস্কৃতিক 'জ্ঞান' শিক্ষা দেয় তা থেকেও শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হচ্ছে। এছাড়াও ইসলামি বাংলা প্রাইমার রচনার প্রেক্ষিতে আর একটি ধর্মীয় কারণ, আমাদের মনে উঁকি দিয়ে যায়, যাকে আমরা অবহেলা করতে পারি না। আসলে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যু জীবনের এই তিন ধারায় তাদের ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ ও আনুষঙ্গিক কর্মকাণ্ডের জন্য ইসলামি জ্ঞানের পাঠ বা রীতি-নীতি জানার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আর সেই প্রয়োজনীয়তার জায়গা থেকেই আজও ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা তার সন্তানকে ন্যূনতম হলেও ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান, সম্ভবপর হলে আরবি ভাষা শিক্ষার পাঠ দিতে চান। যাতে তাদের সন্তান ইসলাম ধর্মের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সারা জীবন চলতে পারে। আর সেজন্যই হয়তো এই ধরনের ইসলামি বাংলা প্রাইমার রচনা জরুরি ছিল ও আছে; হয়তো এই ধারা ভবিষ্যতেও বহমান থাকবে।

অর্পণ পাল

সাহিত্যিক জগদীশচন্দ্র : বাংলা রচনার আলোকে

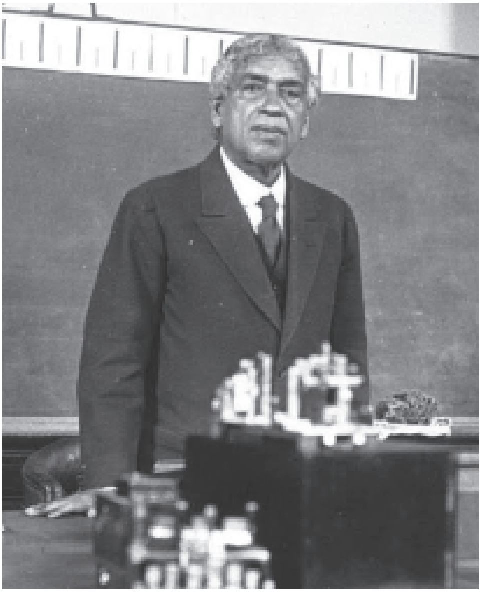

“বৈজ্ঞানিক ও কবি, উভয়েরই অনুভূতি অনির্বচনীয় একের সন্ধানে বাহির হইয়াছে। প্রভেদ এই; কবি পথের কথা ভাবেন না, বৈজ্ঞানিক পথটাকে উপেক্ষা করেন না। কবিকে সর্বদা আত্মহারা হইতে হয়, আত্মসংবরণ করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য। কিন্তু কবির কবিত্ব নিজের আবেগের মধ্য হইতে তো প্রমাণ বাহির করিতে পারে না; এজন্য তাঁহাকে উপমার ভাষা ব্যবহার করিতে হয়। সকল কথায় তাঁহাকে ‘যেন’ যোগ করিয়া দিতে হয়।

বৈজ্ঞানিককে যে পথ অনুসরণ করিতে হয় তাহা একান্ত বন্ধুর এবং পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের কঠোর পথে তাঁহাকে সর্বদা আত্মসংবরণ করিয়া চলিতে হয়। সর্বদা তাঁহার ভাবনা, পাছে নিজের মনে নিজেকে চলিতে হয়। দুই দিক হইতে যেখানে না মিলে সেখানে তিনি এক দিকের কথা কোনোমতেই গ্রহণ করিতে পারেন না।’ (অব্যক্ত)

না বলে দিলে বোঝাই মুশকিল, এ রচনা কোনো সাহিত্যিকের নয়, এ একান্তই এক বিজ্ঞানীর। সাহিত্যের বিশেষ একটি ক্ষেত্র কবিতা এবং বিজ্ঞান কীভাবে একইসঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলে পাশাপাশি, সেটাকেই অনবদ্য ভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করেছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। ১৩১৮ বঙ্গাব্দের পয়লা বৈশাখ, অর্থাৎ ১৯১১-র ১৫ এপ্রিল ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্মেলনে সভাপতি মশাই যে ভাষণ দিয়েছিলেন, সেখানেই উক্ত হয় এই কথাগুলি। পরে তাঁর এই বক্তৃতা 'অব্যক্ত' বইয়ে 'বিজ্ঞানে সাহিত্য' নামে অন্তর্ভুক্ত হয়। একজন বিজ্ঞানী সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতি হচ্ছেন, এ নিদর্শন বড়ো একটা মেলে না। আর এই বিজ্ঞানীকে সকলেই চেনেন, ইনি জগদীশচন্দ্র বসু। বাংলা রচনায় যিনি সমান পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন, সে আমলের প্রথিতযশা যে কোনো সাহিত্যিকের মতোই।

২

তাঁর প্রথম বাংলা রচনা প্রকাশিত হয়েছিল সম্ভবত 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায়, কিন্তু দুঃখের কথা, সে লেখাটির আজ আর সন্ধান পাওয়া যায় না। এই মত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের। তিনি লিখেছিলেন, 'আমার যতদূর মনে পড়ে, তিনি ইংল্যান্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রথমে 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় একটি বাঙ্গলা প্রবন্ধ লেখেন। উহাতে ফসেট পরিবারে তিনি যে আদর ও প্রীতি পাইয়াছিলেন তাহার উল্লেখ আছে।' (প্রদীপ, মাঘ ১৩০৪)

এই রামানন্দবাবুরই একান্ত আগ্রহে জগদীশচন্দ্র কলম ধরেছিলেন বাংলায়। তাঁর সম্পাদিত 'দাসী' পত্রিকায় ১৮৯৪ সালে প্রকাশিত হয় 'ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে' নামে একটি রচনা। লেখাটি পড়লে বোঝাই যায় না যে সেটি বেরিয়েছে এক বিজ্ঞান-অধ্যাপকের হাত থেকে। তখনও যাঁর বিজ্ঞান-গবেষণায় বলার মতো কোনো কাজই প্রকাশ পায়নি। প্রকাশ পায়নি পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞান-গবেষণা পেপারও।

লেখাটি পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। যে জন্য আমরা পরবর্তীকালে দেখব, তাঁরই সম্পাদিত একাধিক পত্রিকায় (যেমন 'দাসী' বা 'প্রবাসী') জগদীশচন্দ্র লিখেছিলেন বেশ কিছু প্রবন্ধ বা ছোটো গদ্য। তাছাড়া প্রবাসী আর মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় জগদীশচন্দ্রের জীবদ্দশায় তাঁকে নিয়ে যত সংবাদ বা গদ্য প্রকাশিত হয়েছিল, সমকালীন আর কোনো বাংলা পত্রিকায় তত লেখা বেরিয়েছিল কি না সন্দেহ।

৩

১৮৯৪ সালে, নিজের ছত্রিশতম বছরটিতে বিজ্ঞান গবেষণা আর লেখালিখি, প্রায় একই সময়ে এই দুই দিকে মন দিতে শুরু করেন জগদীশচন্দ্র। যদিও প্রথমটি তাঁর নিজস্ব আকাশ, দ্বিতীয়টি অবসরের আঙিনা। তবু দুটো মাঠেই সোনা ফলিয়েছেন তিনি। তুলনায় কিঞ্চিৎ অবহেলিত থেকেছে তাঁর মাতৃভাষায় লেখালিখির দিকটি।

তবু যেটুকু লিখেছেন আদরণীয় তার সবটুকুই। আর সেই লেখাগুলিকেই একত্রিত করে প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর একমাত্র একক রচনা সংকলন। বন্ধুদের অনুরোধে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত লেখাগুলিকে একত্রিত করে ১৯২১ সালের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম বাংলা গদ্য সংকলন 'অব্যক্ত'। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে এই বইয়ের একটি কপি সংরক্ষিত রয়েছে। কুড়িটি প্রবন্ধের সংকলন।

প্রথম পাতায় লেখা---অব্যক্ত; আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু, এফ্ আর এস্; নিচে ডান দিকে আড়াই টাকা দাম লেখা। বইটির প্রকাশক 'শ্রী হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ও গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স্। ২০১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।' কালিকা প্রেস থেকে মুদ্রিত হয় বইটি। প্রেসের ঠিকানা '২১, নন্দকুমার চৌধুরী, ২য় লেন, কলিকাতা'। বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৩৪। 'অব্যক্ত'র ভূমিকায় লেখা হল :

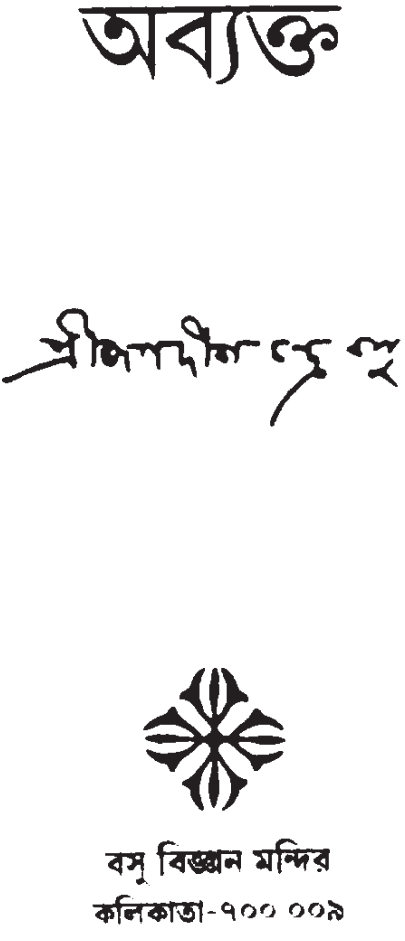
অব্যক্ত

বসু বিজ্ঞান মন্দির
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

'ভিতর ও বাহিরের উত্তেজনায় জীব কখনো কলরব কখনও আর্তনাদ করিয়া থাকে। মানুষ মাতৃক্রোড়ে যে ভাষা শিক্ষা করে সে ভাষাতেই সে আপনার সুখ-দুঃখ জ্ঞাপন করে। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে আমার বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য কয়েকটি প্রবন্ধ মাতৃভাষাতেই লিখিত হইয়াছিল। তাহার পর বিদ্যুত-তরঙ্গ ও জীবন সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছিলাম এবং সেই উপলক্ষ্যে বিভিন্ন মামলা-মোকদ্দমায় জড়িত হইয়াছি। এ বিষয়ের আদালত বিদেশে, সেখানে বাদ-প্রতিবাদ কেবল ইয়োরোপীয় ভাষাতেই গৃহীত হইয়া থাকে। এদেশেও প্রিভি-কাউন্সিলের রায় না পাওয়া পর্যন্ত কোনো মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় না।

জাতীয় জীবনের পক্ষে ইহা অপেক্ষা অপমান আর কি হইতে পারে? ইহার প্রতিকারের

জন্য এদেশে বৈজ্ঞানিক-আদালত স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছি। ফল হয়তো এ জীবনে দেখিব না; প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান-মন্দিরের ভবিষ্যৎ বিধাতার হস্তে।

বন্ধুবর্গের অনুরোধে বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিলাম। চতুর্দিক ব্যাপিয়া যে অব্যক্ত জীবন প্রসারিত, তাহার দু-একটি কাহিনী বর্ণিত হইল। ইহার মধ্যে কয়েকটি লেখা মুকুল, দাসী, প্রবাসী, সাহিত্য এবং ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয়েছিল।—শ্রী জগদীশচন্দ্র বসু। ১লা বৈশাখ ১৩২৮"

বইটি তিনি প্রকাশের পরেই পাঠিয়েছিলেন বন্ধু রবীন্দ্রনাথকে। সঙ্গে চিঠি—'সুখে দুঃখে কত বৎসরের স্মৃতি তোমার সহিত জড়িত। অনেক সময় সে সব কথা মনে পড়ে। আজ জোনাকির আলো রবির প্রখর আলোর নিকট পাঠাইলাম।' (৩ অগ্রহায়ণ ১৩২৮) জগদীশচন্দ্রের শব্দ নিয়ে খেলার ছোট্ট একটা নমুনা এখানে দেখি আমরা; 'রবি' শব্দটি দিয়ে তিনি একই সঙ্গে যে বন্ধুকে এবং আকাশের সূর্যকে বোঝাতে চেয়েছেন, সেটা বোঝা যাচ্ছে।

বইটি পেয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'তোমার "অব্যক্ত'র অনেক লেখাই আমার পূর্বপরিচিত এবং এগুলি পড়িয়া অনেকবারই ভাবিয়াছি যে যদিও বিজ্ঞানবাণীকেই তুমি তোমার সুয়োরাণী করিয়াছ তবু সাহিত্যসরস্বতী সে পদের দাবী করিতে পারিত কেবল তোমার অনবধানেই সে অনাদৃত হইয়া আছে।' (২৪ নভেম্বর ১৯২১)

প্রথম সংস্করণের দাম ছিল আড়াই টাকা, যদিও পরের সংস্করণে দাম কমিয়ে এক টাকা রাখা হয়। ঠিক কত কপি মুদ্রিত হয়েছিল, তা আজ জানার আর উপায় নেই। বেশ কয়েক বছর পর, জগদীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর (১৯৪০) এই বইটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পাঠ্যসূচিতে স্থান পেয়েছিল। আজকের দিনেও, স্কুলস্তরের ছাত্রছাত্রীদের এই বই পাঠ্য হিসেবে থাকা উচিত; আমাদের মনে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

৪

'অব্যক্ত' বইয়ের সব লেখাই যে জগদীশচন্দ্রের স্বতন্ত্র রচনা এমন নয়, কিছু আছে তাঁর বক্তৃতা বা অভিভাষণ। কোন লেখা (বা বক্তৃতা হলে তা প্রদত্ত হওয়ার দিন) কোন পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল, তার তালিকা বানালে সেটা হবে এইরকম—

১/ যুক্তকর। আনুমানিক ১৮৯৪ । কোনো পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছিল কি না জানা যায় না।

২/ আকাশ-স্পন্দন ও আকাশ-সম্ভব জগত। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত সাহিত্য, বৈশাখ, ১৩০২।

৩/ গাছের কথা। মুকুল, আষাঢ়, ১৩০২।

৪/ উদ্ভিদের জন্ম ও মৃত্যু। মুকুল, ভাদ্র ১৩০২।

৫/ মন্ত্রের সাধন। মুকুল, কার্তিক ও অগ্রহায়ণ ১৩০৫।

৬/ অদৃশ্য আলোক। মোসলেম ভারত, ভাদ্র, ১৩২৮।

৭/ পলাতক তুফান। ১৩০৩। নিরুদ্দেশের কাহিনি নাম পাল্টে এই নামকরণ করা হয়। নিরুদ্দেশের কাহিনি কুন্তলীন পুরস্কার পেয়েছিল।

৮/ অগ্নিপরীক্ষা। দাসী, মে ১৮৯৫।

৯/ ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে। দাসী, এপ্রিল ১৮৯৫।

১০/ বিজ্ঞানে সাহিত্য। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনী ময়মনসিংহ অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ।

১১/ নির্বাক জীবন। এই লেখাটি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু তথ্য জানা যায় না।

১২/ নবীন ও প্রবীণ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সভাপতির ভাষণ, পরে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত; চতুর্বিংশ ভাগ, চতুর্থ সংখ্যা ১৩২৪।

১৩/ বোধন। ১৯১৫ বিক্রমপুর সম্মেলন সভাপতির ভাষণ; 'বিক্রমপুরের প্রীতি উপহার' পুস্তিকা; প্রবাসী, মাঘ ১৩২২।

১৪/ মনন ও করণ। এই লেখাটি সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু জানা যায় না।

১৫/ রাণী সন্দর্শন। ভারতবর্ষ, আষাঢ় ১৩২৮।

১৬/ নিবেদন। বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ভাষণের অনুবাদ। তিনটি পত্রিকায় বেরিয়েছিল লেখাটি: ক. নারায়ণ, অগ্রহায়ণ ১৩২৪; খ. প্রবাসী পৌষ ১৩২৪; গ. সাহিত্য পৌষ ১৩২৪।

১৭/ দীক্ষা। এটা বিজ্ঞান মন্দিরে প্রদত্ত ভাষণ।

১৮/ আহত উদ্ভিদ। ৭ চৈত্র, ১৩২৪; সাহিত্য পরিষদে সভাপতির ভাষণ; প্রবাসী, বৈশাখ ১৩২৬।

১৯/ স্নায়ুসূত্রে উত্তেজনা প্রবাহ; ৯ আশ্বিন ১৩২৭ সাহিত্য পরিষৎ এ বক্তৃতা; সভাপতি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

২০/ হাজির! প্রবাসী, বৈশাখ ১৩২৮।

৫

'অব্যক্ত' বইটির কত যে সংস্করণ হয়েছে, তার কি ইয়ত্তা আছে? এর প্রথম সংস্করণ সম্বন্ধে আগেই তথ্যাদি দেওয়া হয়েছে। এই সংস্করণের বইটি পুনর্মুদ্রিত হয় ১৯৩৮ সালের জানুয়ারি মাসে। এরপরে তৃতীয় মুদ্রণ হয় ভাদ্র ১৩৫৮ অর্থাৎ আগস্ট ১৯৫১ সালে। সেটা ছিল বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সংস্করণ।

১৯৪৮ সালে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চায় উন্নতির লক্ষ্যে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয় আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর হাত ধরে। আর ওই বছর থেকেই শুরু হয় এই সংস্থার উদ্যোগে একটি পত্রিকা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'। এই সংস্থা অন্য নানা কাজের পাশাপাশি

বাংলায় বিজ্ঞানভিত্তিক বইপত্র প্রকাশের একটি পরিকল্পনা নিয়েছিল, যার প্রথম ফল, ‘অব্যক্ত’-র পুনঃপ্রকাশ। যার প্রকাশকাল ১৯৫১। দাম নির্ধারিত হয় সাড়ে তিন টাকা। এই সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ হয় পৌষ ১৩৬৪ তে, ওই বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ থেকে।

এরপর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর জন্মশতবার্ষিক সমিতি, ৯৩/১ আপার সারকুলার রোড, কলকাতা-৯ এর ব্যবস্থাপনায় বইটি পুনর্প্রকাশিত হয়। মুদ্রক হিসেবে নাম ছিল গোপালচন্দ্র রায়ের। নাভানা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভেনিউ, কলিকাতা-১৩ থেকে মুদ্রিত। পুলিনবিহারী সেন এটি সম্পাদনা করেন। এতে আগের সংস্করণের মূল কুড়িটা লেখাকে অপরিবর্তিত রেখে সঙ্গে যুক্ত করা হয় একটি ‘বৃক্ষের অঙ্গভঙ্গী’ নামের একটি ‘সংযোজনা’; যা অনেক কাল আগে প্রকাশিত হয়েছিল। পরিশিষ্টে আরও সংযুক্ত হয় ‘নিরুদ্দেশের কাহিনী’ এবং ‘ছাত্র সমাজের প্রতি’ শীর্ষক দুটি ভাষণ।

বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ব্যবস্থাপনায় ‘অব্যক্ত’ এ যাবত প্রকাশিত হয়েছে আরও দু’বার; আষাঢ় ১৩৯৬ (জুন ১৯৮৯) এবং মাঘ ১৪১২ (জানুয়ারি ২০০৬)-এ। কলকাতার কয়েকটি বড়ো ছোটো প্রকাশনা সংস্থা এখনও নিয়মিতভাবে ‘অব্যক্ত’ পুনর্মুদ্রিত করে চলেছে।

৬

‘অব্যক্ত’ বইয়ের সবচেয়ে বেশি পরিচিত রচনা সম্ভবত ‘ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে’। ভ্রমণপ্রিয় জগদীশচন্দ্র ১৮৯৩ সালের মে মাসে কুমাউন হিমালয় ভ্রমণে গিয়েছিলেন সস্ত্রীক, সেই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তিনি লেখেন তাঁরই প্রাক্তন ছাত্র রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধে। ‘দাসী’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল সেই লেখা। জগদীশচন্দ্র সত্যিই এত ভালো বাংলা লিখতে পারেন কি না, তা নিয়ে প্রথমে সংশয় ছিল প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁর সহকর্মী প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের। তিনি ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে রচনাটি পড়ে মন্তব্য করেছিলেন, এই লেখাটি নির্ঘাত জগদীশচন্দ্রের বোন লাবণ্যপ্রভার, দাদা বোনের লেখা নিজের নামে প্রকাশ করেছেন মাত্র। যদিও পরে তাঁকে সে ভুল ধারণা ত্যাগ করতে হয়। প্রমথনাথ বিশী লিখেছিলেন, ‘ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে’ জগদীশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনা। এই অত্যাশ্চর্য রচনাটি বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের একটি পরম সম্পদ।

এই বইয়ের আর একটি বিখ্যাত রচনা, যেটা তাঁর রচিত একমাত্র গল্পও। তার নাম ‘নিরুদ্দেশের কাহিনী’। বাংলা ভাষায় প্রথম কল্পবিজ্ঞান বা সায়েন্স ফিকশন এটি, এমনটা বলা হত অনেক কাল; যদিও পরে গবেষক সিদ্ধার্থ ঘোষ দেখান যে, জগদীশচন্দ্রেরও অনেক কাল আগে ১৮৮২ সালে জোড়াসাঁকো ৫ নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি থেকে প্রকাশিত সচিত্র ‘বিজ্ঞান দর্পণ’ পত্রিকায় প্রকাশ পাওয়া হেমলাল দত্তর লেখা ‘রহস্য’ গল্পটিকে বাংলায় লেখা প্রথম সায়েন্স ফিকশন হিসেবে গণ্য করা উচিত।

পড়লেই বোঝা যায় পুরস্কারের উদ্দেশ্যেই লেখা হয়েছিল 'নিরুদ্দেশের কাহিনী'। নিচে ছিল সাব-টাইটেল 'বৈজ্ঞানিক রহস্য'। সিদ্ধার্থ ঘোষ লিখছেন, 'সায়েন্স-এর সঙ্গে ফিকশন অথবা ফ্যান্টাসিকে যুক্ত করে জোড়কলম শব্দ দু-টি ইংরেজিতে আবির্ভূত হওয়ার বহু পূর্বেই জগদীশচন্দ্র স্বাধীন ও সচেতনভাবে এই বাংলা পরিভাষা নির্মাণ করেছেন।' (প্রবন্ধ সংগ্রহ'-১, বুক ফার্ম)

কুন্তলীন পুরস্কার প্রাপ্তির লক্ষ্যে রচিত হয়েছিল 'নিরুদ্দেশের কাহিনী'। প্রথম বছরেই প্রথম পুরস্কার পেয়েছিল গল্পটি। সেটা ছিল ১৮৯৬ সাল। তবে লেখাটিতে লেখকের নাম ছিল না। অনামা লেখকের পরামর্শমতো পুরস্কারের অর্থমূল্য প্রদান করা হয়েছিল সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের নীতিবিদ্যালয়কে। জগদীশচন্দ্র পারিবারিকভাবে ছিলেন ব্রাহ্ম, সেই কারণেই তিনি এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকবেন। তাঁর শ্বশুরমশাই দুর্গামোহন দাসও ছিলেন সে আমলের প্রখ্যাত ব্রাহ্ম নেতা। উক্ত বিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন তিনি।

বছর কয়েক পরে ১৯১০ সালে প্রথম বারো বছরের কুন্তলীন পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখাগুলো নিয়ে একটি বই প্রকাশিত হয়, যার নাম 'কুন্তলীন পুরস্কারের দ্বাদশ প্রথম'। এই বইয়ে জগদীশচন্দ্রের আলোচ্য গল্পটি অন্তর্ভুক্ত ছিল। আরও পরে 'অব্যক্ত' বইয়ে রচনাটিকে স্থান দেওয়ার সময় লেখক এর নাম পাল্টে করেন 'পলাতক তুফান'; কিছু পরিমার্জনাও করা হয় এই পর্বে। উল্লেখ্য, জগদীশচন্দ্র এই একটিই গল্প লিখেছিলেন সারা জীবনে। বাংলায় তাঁর অত দক্ষ লেখার হাত থাকা সত্ত্বেও কেন তিনি আর এদিকে নজর দিলেন না, সেটা আজ ভেবে ওঠা দুষ্কর।

৭

'অব্যক্ত' ছাড়া জগদীশচন্দ্রের বাংলা রচনার সংকলনের অভাব নেই। ১৯২১ সালে প্রথম বই বের হওয়ার পর আজ অব্দি কত যে প্রকাশনা তাঁর লেখার সংকলন, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'অব্যক্ত' বইটিরই পুনর্মুদ্রণ ছাড়া কিছুই নয়, প্রকাশ করেছেন এবং করে চলেছেন, ইয়ত্তা নেই তার। তবে বাংলা বাজারে একাধিক এমন সংকলন বেরিয়েছে যেখানে তাঁর 'অব্যক্ত' থেকেই কিছু লেখা আর চিঠিপত্র একত্র করে পরিবেশন করা হয়েছে। বাংলায় খুব বেশি লেখেননি জগদীশচন্দ্র, কিন্তু যেটুকু লিখেছেন, উচ্চ মানের সাহিত্য হিসেবেই বিবেচিত হয়েছে তা। দুটো সংকলনের কথা আমরা এখন বলতে পারি, যার প্রথমটির নাম 'কিশোর রচনা সমগ্র'। বইটির প্রকাশ-তথ্য :

লেখক : জগদীশচন্দ্র বসু।

সংকলন ও সম্পাদনা : দিবাকর সেন।

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ, ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কল-৯।

প্রচ্ছদ : অলোক শঙ্কর মৈত্র।

প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ ১৩৯১ (১৯৮৪)। মূল্য পঁচিশ টাকা।

বইটির শুরুতে রয়েছে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের তৎকালীন অধিকর্তা শশাঙ্কচন্দ্র ভট্টাচার্য-র লেখা ভূমিকা।

এই বইটি নিয়ে কিছু কথা বলা দরকার। প্রথমত, দেখে নেওয়া যাক বইয়ের সূচি :

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। গাছের কথা, উদ্ভিদের জন্ম ও মৃত্যু, মন্ত্রের সাধন, অদৃশ্য আলোক, ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে, নির্বাক জীবন, আহত উদ্ভিদ, স্নায়ু সূত্রে উত্তেজনাপ্রবাহ, বৃক্ষের অঙ্গভঙ্গী, উদ্ভিদের হৃদস্পন্দন।

গল্প। পলাতক তুফান, অগ্নি পরীক্ষা।

বিবিধ প্রসঙ্গ। রানী সন্দর্শন, বোধন, নিবেদন, প্রশ্নোত্তর বিভাগে আচার্য জগদীশচন্দ্রের উত্তর, ভারতের যুবকগণের প্রতি জগদীশচন্দ্র, শ্রদ্ধাঅর্ঘ্য।

ভ্রমণবিষয়ক রচনা। লুপ্ত নগরী, আগ্নেয়গিরি দর্শন, লন্ডনের গল্প, ওয়েস্ট মিনিষ্টার এবি, পার্লেমেন্ট দর্শন, চিতোর দর্শন, লক্ষ্ণৌ ভ্রমণ, মাদ্রাজ ভ্রমণ, কাশ্মীর, ভেনিস।

বিবিধ রচনা। নাদিরশার শাস্তি, অদ্ভুত কৌশল, বিহারীলাল গুপ্ত, পারিবে কি? বন্দীর মুক্তি, ইতর প্রাণীদের দয়া, সুরেশদের বাগান।

বক্তৃতাবলী। ময়মনসিংহ অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ, ছাত্র সমাজের প্রতি, বসুবিজ্ঞান মন্দিরের নবম বার্ষিকী উৎসব, বসুবিজ্ঞান মন্দিরের দশমবর্ষ পূর্তি, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব, মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব, ট্রপিক্যাল মেডিসিন কংগ্রেসের অধিবেশন।

পরিশিষ্ট। রবীন্দ্রনাথকে লিখিত নির্বাচিত পত্রাবলী, প্রবাসী পত্রিকার পঁচিশ বছর পূর্তিতে শুভেচ্ছা বাণী, বিদ্যাসাগর বাণীভবনের ছাত্রীদের প্রতি, স্বর্গীয় মহাত্মা আনন্দমোহন বসু, নিরুদ্দেশের কাহিনী, বৃক্ষের জন্ম ও মৃত্যু, কুমুদিনীর নিশিজাগরণ, গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত রচনা, জীবনপঞ্জী।

সব মিলিয়ে এই সূচি দেখে মনে হতে পারে যে অব্যক্ত-র বাইরেও জগদীশচন্দ্র নিশ্চয়ই আরও অনেক গদ্যই লিখেছিলেন। প্রসঙ্গত আরও কিছু কথা বলে নেওয়া দরকার—

প্রথমত, এই বইয়ে ভ্রমণ বিষয়ক রচনার প্রায় সবই আসলে জগদীশ-পত্নী অবলা বসুর লেখা। অনেকেরই হয়তো জানা আছে, অবলা দেবী ছিলেন সে আমলের ডাক্তারির ছাত্রী এবং প্রচুর পড়াশুনো ছিল তাঁর। তিনি নানাবিধ সামাজিক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকতেন সবসময় এবং তাঁর লেখার হাতও ছিল চমৎকার। সম্প্রতি দময়ন্তী দাশগুপ্ত-র সম্পাদনায় 'অবলা বসুর ভ্রমণ কথা' নামে চমৎকার একটি বই প্রকাশিত হয়েছে পরশপাথর প্রকাশনা থেকে; ওখানেই মিলবে এই লেখাগুলি।

দ্বিতীয়ত, আমাদের দেশে পত্রপত্রিকার সংরক্ষণের হাল অতি খারাপ। তাই এমন বহু পত্রিকা আজ অবলুপ্ত হয়ে গেছে, যেগুলিতে জগদীশচন্দ্রের রচনা থাকা খুবই সম্ভব। আর

তাঁর বহু ভাষণেরই লিখিত রূপ সংরক্ষিত হয়নি, যেগুলি থাকলে আমরা জগদীশচন্দ্রের রচনা সংকলনে আরও লেখা পেতাম। মনে পড়বে, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা সংকলনে অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ রচনাই আসলে তাঁর বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত ভাষণ।

দ্বিতীয় একটি বই 'রচনা সংগ্রহ'। দে'জ থেকে প্রকাশিত। এই বইটি সম্পাদনা করেছেন অরূপরতন ভট্টাচার্য এবং শৈলেন চক্রবর্তী। বইটির প্রথম প্রকাশ ২০১৩, পুনর্মুদ্রণ হয় ২০১৮ তে। এতে রয়েছে: জগদীশচন্দ্রকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ, মেঘনাদ সাহা, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও সরলা দেবী চৌধুরাণীর গদ্য, পুরো 'অব্যক্ত' বইটিই, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চালাচালি হওয়া চিঠিপত্রগুলি, অন্যান্য কয়েকজন বিশিষ্টজনকে লেখা তাঁর কয়েকটি চিঠি, তাঁর কয়েকটি যন্ত্রপাতির সচিত্র বিবরণ (রচনা সংগ্রহতে কেন তাঁর তৈরি যন্ত্রের বর্ণনা দেওয়া, তা যদিও বুঝে ওঠা দুষ্কর), রয়েছে তাঁর কয়েকটি ইংরেজি বক্তৃতা ও রচনা, তাঁর মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া এবং তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি। জগদীশচন্দ্রের বাংলা রচনার এটাই আপাতত সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সংকলন। এ ছাড়াও আরও একটি সংকলন বাজারে প্রচলিত আছে, পত্রভারতী-র 'জগদীশচন্দ্র সেরা রচনা সংকলন', সেখানেও আগের মতো ভ্রমণ-বিষয়ক রচনাগুলিকে তাঁর লেখা বলেই দাবি করা আছে। এই ত্রুটি আশু সংশোধিত হওয়া জরুরি। যদিও এই বইটি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য, বহুকাল ছাপা হয় না।

পরিশেষে আরও একটি কথা বলা দরকার, বাংলা রচনায় সিদ্ধহস্ত জগদীশচন্দ্র অন্য একটি ব্যাপারেও কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন: তিনিই প্রথম বিজ্ঞানী, যিনি নিজের গবেষণার বিষয়কে বাংলায় সহজবোধ্যভাবে লেখবার প্রয়াস করেছিলেন। তাঁর পরে আরও বহু বাঙালি বিজ্ঞানে বলবার মতো কাজ করেছেন, কিন্তু তাঁর মতো নিজের গবেষণার বিষয়বস্তুকে সাধারণ মানুষের বোধগম্য করে লেখবার প্রয়োজন বা তাগিদ অনুভব করেননি। এখানেই তিনি অনন্য এবং প্রণম্য।

ই তি হা স

মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ঈসা খান

ঈসা খান মসনদ-ই-আলা (১৫৩৭-১৫৯৯) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এক কিংবদন্তী পুরুষ। তাঁর অসম সাহস ও অন্যান্য গুণাবলীর কারণে তাঁর প্রতিপক্ষ সম্রাট আকবরের সভাসদ আবুল ফজলও বিমোহিত হয়েছিলেন। সম্রাট আকবরের রাজ্যশাসন সংক্রান্ত সরকারি গেজেট 'আইন-ই-আকবরী' এবং ইতিহাসগ্রন্থ 'আকবরনামা'-য় ঈসা খানের জীবনের বিচিত্র ঘটনাবলীর উল্লেখ রয়েছে। শ্রীচৈতন্য পরবর্তী বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে যে সংস্কারধর্মী যাত্রা শুরু হয় এর সুযোগে বেশ কয়জন কবি সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটে; যাদের অধিকাংশই ঈসা খানের সময়কালের।

কবি আলাওল, কবি দ্বিজবংশী দাস, সৈয়দ সুলতান, মহিলা কবি চন্দ্রাবতী, নিত্যানন্দ দাস, আবদুল হাকিম প্রমুখ কবি সাহিত্যিক এ সময়কালে আবির্ভূত হন। এ সময় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে কিছু বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। সম্রাট আকবরের নির্দেশে চান্দ্রমাস ভিত্তিক হিজরী সনের পরিবর্তে বাংলাদেশের জন্য সৌরমাস ভিত্তিক ফসলি সন প্রবর্তন করা হয়। সম্রাটের অর্থনীতি বিষয়ক সহকারী আমীর ফতেহউল্লাহ শিরাজী এ সন প্রবর্তন করেন। এ ফসলি সনই পরবর্তীতে বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে বাংলা সন নামে পরিচিত হয়। এ সনের ভিত্তি বৎসর হিসাবে সম্রাটের সিংহাসন আরোহনের বছর অর্থাৎ ৯৬৩ হিজরিকে ৯৬৩ বাংলা ধরে

পরবর্তী অংশ সৌরসনে রূপান্তর করা হয়, যা ১৫৫৬ ঈসায়ি বা খ্রিস্টীয় সন হয়। অবশ্য সম্রাটের সিংহাসন আরোহনের অনেক পরে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়। বাংলাদেশের লোকদের জীবনযাত্রা ফসল ভিত্তিক হওয়ায়, তদুপরি ঈসা খানের পুনঃপুনঃ বিদ্রোহ ও যুদ্ধের কারণে এ এলাকার ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা ঐ সময় প্রায় বিধ্বস্ত অবস্থায় ছিল। রাজস্ব ব্যবস্থার পুনরুদ্ধারের জন্যই এসময় ফসলি সন নামক বাংলা সন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়।

রুকন উদ্দিন বরবক শাহ (১৪৫৯-১৪৭৪), আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (১৪৯৪-১৫১৯) ও নাসিরুদ্দিন নসরৎ শাহের (১৫১৯-১৫৩২) সময়ে সূচিত বাংলা ভাষাচর্চার ধারা ঈসা খান (১৫৩৭-১৫৯৯) এর সময়ে একটা পর্যায়ে উন্নীত হয়। এ সময় কবি সাহিত্যিকগণ তাঁদের লেখায় বাংলাভাষার সপক্ষে কথা বলতে শুরু করেন। কবি সৈয়দ সুলতান (১৫৫০-১৬৪৮) তাঁর ‘রসূল চরিত’ নামক কাব্যগ্রন্থ বাংলা ভাষায় রচনা করেন। আরবি ভাষা বাঙ্গালিরা না বুঝার কারণেই বাংলা ভাষায় ‘রসুল চরিত’ রচনাকালে তিনি উল্লেখ করেন; ‘গ্রহশত রস যোগে অব্দ গোঁঞাইল।/দেশী ভাষে এই কথা কেহ না কহিল/কর্ম দোষে বাংলাতে বাঙালী উৎপণ।/না বুছে বাঙালী সবে আরবী বচন’। সমসাময়িককালের কবি আবদুল হাকিম (১৬০০-১৬৭০) এর লেখায় আরো জোরালোভাবে বাংলা ভাষার পক্ষে যুক্তি পেশ করা হয়। কবি বলেন—‘যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।/সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি/দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়াএ।/নিজদেশ ত্যাগি কেন বৈদেশ না যাএ/মাতা পিতামহ ক্রমে বঙ্গেত বসতি।/দেশী ভাষা উপদেশ মন হিত অতি/ন চিনি আরবী বাক্য ন চিনি অক্ষর।/তে কাজে আশ্বাস মনে ভাবি বহুতর/নিজ দেশী ভাষা করি গৃহেতে সকল।/অহ্মি সব আগে কর সংকট কুশল’।

ষোড়শ শতকের আরও পূর্ব থেকে প্রচলিত বিভিন্ন সুরের মধ্যে ‘ভাটিয়ালী রাগেন’ নামে সংস্কৃত প্রভাব মুক্ত যে রাগ বা ভিন্ন সুরটি সৃষ্টি হয় তা ভাটী অঞ্চলের লোকদের মুখের ভাষার উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠে। সম্রাট আকবরের সভাসদ আবুল ফজলের ভাষায় ঈসা খান ছিলেন ‘মর্জুবানে ভাটী’ তথা ভাটীর রাজা। ভাটী অঞ্চলে তাঁর সময়ে এবং পরবর্তী সময়ের ঘটনাপ্রবাহ ভিত্তিক যে সব লোকপালার সৃষ্টি হয় তা গোটা বাংলা সাহিত্যের গৌরবের বস্তু। ঈসা খান সমসাময়িক কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের কবি দ্বিজবংশী দাস রচিত ‘পদ্মপুরাণে’ তাঁর সময়কালের কথা বর্ণিত হয়েছে এভাবে—‘জলধির বামেতে ভুবন মাঝে দ্বার।/শকে রচে দ্বীজবংশী পুরাণ পদ্মার’। এ শ্লোকটিতে ‘অংকস্য বামাগতি’র নিয়ম প্রয়োগ করলে ১৪৯৭ শক বা ১৫৭৫ খ্রিস্টীয় সন পাওয়া যায়। ঈসা খানের সমসাময়িক কিশোরগঞ্জের আরেক কবি নিত্যানন্দ দাস তাঁর ‘প্রেম বিলাস’ কাব্যে উল্লেখ করেন—‘বঙ্গদেশে কামরূপ রাজ্য অতি শুদ্ধ। পাঠানে লইল তাহা করি মহাযুদ্ধ/সেই দেশের রাজধানী এগার সিন্দুর।/ ভ্রহ্মপুত্র পাড়ে স্থিত অতি মনোহর।’

এ লেখায় যুদ্ধের মাধ্যমে এ এলাকা বিজয় এবং 'ঈসাখানঁ-মানসিংহ' যুদ্ধখ্যাত এগার সিন্দুরের কথা বর্ণিত হয়েছে। একই সময়ে কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের আরেক কবি মাধবাচার্য 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' ও 'চণ্ডিকাব্য' রচনা করেন। চণ্ডীকাব্যে উল্লেখিত শ্লোক থেকে তাঁর কাব্য রচনার কাল জানা যায়—'ইন্দু বিন্দু বাণ দাতা শক নিয়োজিত।/দ্বিজ মাধবে গায় সারদা চরিত'। আঙ্কিক শব্দ যোগে লিখিত এ শ্লোকের পাঠ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় এর লিপিকাল ১৫৭৮/৭৯ খ্রিস্টাব্দ। ঈসা খানের সময়ে সম্রাট আকবরের অভিভাবক বৈরাম খানের পুত্র নবাব আবদুর রহিম খান-ই-খানান ফার্সি-সংস্কৃত মিশ্র বাংলা ভাষায় রচনা করন 'খেট কৌতুকম' নামক জোতির্বিদ্যা বিষয়ক কাব্য। সম্রাট আকবরের দরবারে প্রেরিত এলিজাবেথীয় দূত রালফ ফিচ ১৫৮৬ সালে ঈসা খানের রাজধানী সোনারগাঁও পরিদর্শনে এসে ঈসা খানের রাজত্বের সুখ-সম্মৃদ্ধির বর্ণনা দেন—

'Sinnargaon is a town six Leagues from Sreepur where there is the best and finest cloth made of cotton that is in all India, The chief king of all these countries is called Isa can and he is chief of all other kings, and is a great friend of all Chritians. The houses here, as they are in the most part of India, are very little and covered with straw and have a few mats round about the walls and the doors to keep out the tigers and the foxes. Many of the people are very rich. They live upon rice, milk and fruits. They go with a little cloth before them and all the rest of their body is naked. Great store of cotton cloth goes from here and much rice where with they serve all India Cylon, Pegu, Malacca, Snmatra and many other island places.'

সোনারগাঁয়ে (ইছাপুরা) ঈসাখান পুত্র মূসাখানের ভগ্নপ্রায় প্রাসাদবাড়ী

'তাঁর বর্ণনায় যে সূক্ষ সূতিবস্ত্রের উল্লেখ রয়েছে তা হল বিশ্বখ্যাত মসলিন। সোনারগাঁও ছাড়াও এ মসলিন ঈসা খানের দ্বিতীয় রাজধানী জঙ্গলবাড়িতে এবং বাজিতপুরে তৈরি হতো। জঙ্গলবাড়িতে তৈরি 'জঙ্গলখাস' নামক মসলিন ছিল জগদ্বিখ্যাত। তাঁর সময়ে লোকেরা স্বাচ্ছন্দ জীবন যাপন করতো এর প্রমাণ পাওয়া যায় রালফ ফিচের এ ভ্রমণ বিবরণীতে। ঈসা খান কৃষকদের জমির খাজনা ধার্য করেছিলেন খুব কম হারে। জমিতে ধান্য রোপণ করার সময় কৃষকরা মনের আনন্দে গান গাইত 'কানিক্ষেত লাগিল চৌদ্ধ বুড়ি'। এই চৌদ্ধ বুড়ি ছিল সাড়ে তিন আনার সমান। ঐসময়ে যে মুদ্রা ব্যবস্থা চালু ছিল তা প্রাচীন ভারতীয় ধারার। সমসাময়িক মুদ্রাব্যবস্থার একটি হিসাব এখানে পেশ করা হল—

৪ কড়ি	=	১ গণ্ডা
৫ গণ্ডা	=	১ বুড়ি বা পয়সা
৪ বুড়ি বা পয়সা	=	১ আনা বা পণ
৪ পণ বা আনা	=	১ চৌক
৪ চৌক	=	১ টাকা

ঐ সময়ের লেখকদের লেখায় টাকার হিসাবের এসব এককের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'মৈমনসিংহ গীতিকা'-র 'দস্যু কেনারামের পালায়' 'মনসামঙ্গল' নামে দ্বিজবংশী দাস রচিত কাব্যে যে বন্দনা দেওয়া হয়েছে সেখানে মা'কে বন্দনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে—'এক স্তনের দুগ্ধে হবে লক্ষকড়ি মূল।/আমি পুত্রে বেচিলে না হবে সমতুল।।'

এখানে লক্ষকড়ি মূল বলতে লক্ষকড়ি মূল্য বুঝানো হয়েছে। সমসাময়িক কবি কঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (জন্ম : ১৫৩৭) তাঁর রচিত চন্ডীমঙ্গল কাব্যে উল্লেখ করেন—

'মোল্লায় পড়ায় নিকা দান পায় সিকা সিকা
দোয়াপড়ে কলেমা পড়িয়া।
করে ধরে খর ছরি মুরগী জবাই করি
দশগণ্ডা দান পায় কড়ি।।
বখরী যবাই যথা মোল্লারে দেয় মাথা
দান পার কড়ি ছয় বুড়ি।।'

মুকুন্দরামের কাব্যে 'কড়ি' 'বুড়ি' এবং সিক্কা তিনটি মুদ্রার উল্লেখ রয়েছে। উল্লেখ্য মুকুন্দরামের কাব্যে ঈসা খানের প্রতিদ্বন্দ্বী মানসিংহের উল্লেখ পাওয়া যায়। ফলে তিনি যে একদম ঈসা খান এর সমসাময়িক তাতে আর কোন সন্দেহ থাকে না। বয়সের হিসাবেও তিনি ঈসা খান এর জন্ম বছরেই জন্মগ্রহণ করেন।

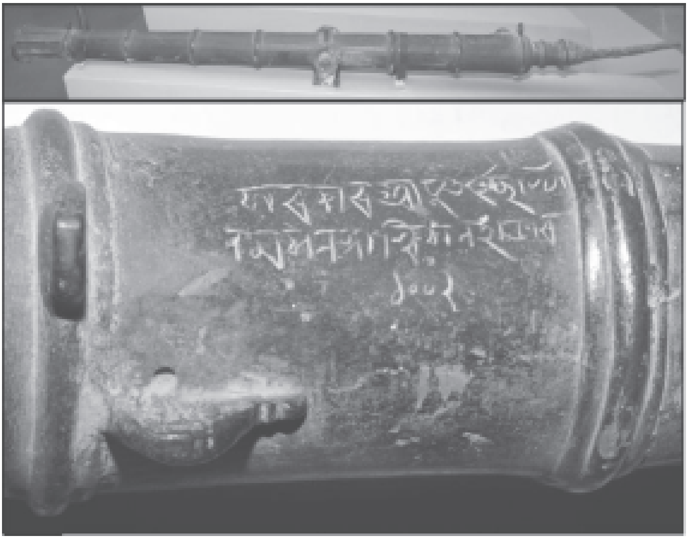

ঈসাখানের কামান। এতে বাংলাভাষায় ‘ইছাখান মসনদ্বালি’ লেখা রয়েছে।

বাংলাদেশে জন্মগ্রহণকারী ঈসা খান নিজেও বাংলা ভাষার প্রেমিক ছিলেন। আমরা এর প্রমাণ পাই তাঁর তৈরি কামান গাত্রে খুদিত নাম থেকে। ১৯০৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি নারায়নগঞ্জ টাউনের ৭ মাইল পূর্ব দিকে অবস্থিত দেওয়ানবাগ নামক স্থান থেকে ঈসা খানের ৭ টি কামান উদ্ধার করা হয় (যা বর্তমানে ঢাকা জাদুঘরে রক্ষিত)। এ কামানগুলোর বাড়তি বৈশিষ্ট্য এই, যে এতে বাংলার শক্তির প্রতীক রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মুখ দিয়ে কামানের মুখাংকিত। বাংলার ঐতিহ্য মণ্ডিত এ ব্যাঘ্রমুখ কামানের একটির গায়ে বাংলা অক্ষরে ‘শ্রীযুত সরকার ঈছাখান মসনদ্বালি সন ১০০২’ লেখা রয়েছে। উপরোক্ত আলোচনার নিরিখে একটি কথা স্পষ্ট করে বলে রাখা ভাল, বাঙ্গালীর শক্তিমত্তার প্রতীক ‘বাঘ’ এ বোধটি প্রথম এসেছিল ঈসা খান মসনদ-ই-আলার প্রয়োগ থেকে।

ঈসা খানকে নিয়ে গড়ে উঠা বিভিন্ন রূপকথা, পালা ও কিংবদন্তী ড. দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত মৈমনসিংহ গীতিকা, পূর্ববঙ্গ গীতিকা ও বৃহৎ বঙ্গ ইত্যাদি গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। দেওয়ান ঈছা খাঁ’র পালা, মনহর খাঁ দেওয়ানের পালা, ফিরোজ খাঁ দেওয়ান, বীরাঙ্গনা সখিনা, আদম খাঁ ও বিরাম খাঁ’র পালা ইত্যাদি ছাড়াও আর যেসব পালা সংগৃহীত হয়েছে তা আজ শুধু বাংলাভাষাভাষি জনগোষ্ঠীরই নয় বরং সারা পৃথিবীর লোকসাহিত্যিকদের গবেষণার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। শুধু মৈমনসিংহ গীতিকাই এ যাবৎ ১৮টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

ঈসা খানকে নিয়ে এযাবৎ বিস্তর লেখালেখি হয়েছে। ইংরেজ লেখক ডা. ওয়াইজ নিজে জংগলবাড়ী গিয়ে ঈসা খাঁনের বংশধরদের কাছ থেকে তাদের পূর্বপুরুষদের ইতিহাস এবং এতদসংক্রান্ত দলিল দস্তাবেজ সংগ্রহ করে ঈসা খান ও তার বংশের

ঐতিহাসিক জঙ্গলবাড়ীতে ঈসাখানের (ভগ্নপ্রায়) প্রাসাদবাড়ী।

ইতিহাস লেখেন। বিগত শতাব্দীতে এশিয়াটিক সোসাইটি জার্নালেও বিভিন্ন সময় ঈসা খাঁকে নিয়ে লেখা হয়েছে। আইন-ই-আকবরীর অনুবাদক এইচ ব্লকম্যান এবং আকবর নামার অনুবাদক এইচ. বেভারিজ ঈসা খান প্রাসঙ্গিক অংশের ফুটনোটে তাঁদের গবেষণাকর্মের ফসলে উদ্ধৃত করেছেন। এছাড়া আলাদাভাবেও তাঁরা ঈসা খানকে নিয়ে বই লিখেছেন। ১৬০৮ থেকে ১৬১২ সময়কালে মির্জা নাথান কর্তৃক ‘বাহারিস্তান-ই-গায়বি’ নামক ইতিহাস গ্রন্থে ঈসা খান, মুসা খান, মাসুম খান সহ ঈসা খান বংশ এবং বারভুইয়াদের প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে। ত্রিপুরার রাজা অমরমানিক্যের রাজমালা নামক কাব্যগ্রন্থে ঈসা খানকে নিয়ে বহু শ্লোক রচিত হয়েছে। ১৮৬০ সালে কিশোরগঞ্জের মুন্সী আবদুর রহিম রচিত দেওয়ান ইছাখান মছনদ আলী পুঁথি প্রকাশিত হয়। ১৮৯১ সালে মুন্সী রাজচন্দ্র এবং পিতা কালিকুমার চক্রবর্তীর লিখিত ‘মসনদ

আলী ইতিহাস' ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। ১৯০৪ সালে কলিকাতার লেখক মুহাম্মদ ইছহাক জংগী লিখিত ঈসা খানের জীবনী, ময়মনসিংহের কেদারনাথ মজুমদার কর্তৃক ময়মনসিংহের ইতিহাস ১৯০৬ সালে এফ. বি. ব্রাডলি বার্ট কর্তৃক রোমান্স অব এন ইস্টার্ণ ক্যাপিটাল প্রকাশিত হয়। ১৯০৬ সালে ইসমাইল হোসেন সিরাজী লিখিত 'রায় নন্দিনী' উপন্যাস এবং ১৯১৬ সালে কলিকাতার লেখক ফজলুর রহমান মিয়া রচিত 'ঈসাখাঁ ও রায় নন্দিনী' প্রকাশ পায়। ১৯২৮ সালে ২২৮ পৃষ্ঠার এ বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় যার কপি লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরির ইন্ডিয়া অফিস গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। ইসমাইল হোসেন সিরাজীর 'রায় নন্দিনী'র প্রায় অবিকল নকল করে কলিকাতার লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও একটি লেখা তাঁর বইয়ে স্থান দিয়েছেন যেটি কয়েক বছর আগে ছাপা হয়েছে। ১৯২৭ সালে জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ানদের অধীনে কর্মরত পূর্ণচন্দ্র রায় 'উচ্ছ্বাস' নামক একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন।

এ গ্রন্থে রয়েছে ঈসা খানের দুর্লভ তসবির (হাতে আঁকা ছবি)। জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ানদের তত্ত্বাবধানে দীর্ঘ ৮ বৎসরকাল গবেষণা করে নূরুল হোসেন কাশিমপুরী (১৮৮৫ -১৯৩৪) চারখণ্ডে 'ঈসাখাঁ ইতিবৃত্ত' রচনা করেন। পরবর্তীতে জমিদারি চলে যাওয়ায় এ ইতিহাস আর ছাপানো সম্ভব হয়নি। ক্ষোভে, দুঃখে অভিমানে জনাব কাশিমপুরী কিশোরগঞ্জ ত্যাগ করে বগুড়ায় যেয়ে এক মাদ্রাসায় চাকুরি করে বাকি জীবন কাটিয়ে দেন। তাঁর এ দুর্লভ সংগ্রহ কোথায় আছে তা বলা কঠিন। তাঁর রচিত মোট ৩৬টি বিভিন্ন মূল্যবান পাণ্ডুলিপির অনেকগুলো দৈনিক আজাদ অফিস এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত আছে বলে জানা যায়। তিনি উসমান খান লোহানী এবং বঙ্গবীর দেওয়ান মনোয়ার খানের নামের ইতিহাস রচনা করেন। খুলনার বাগেরহাটের জনাব শফিউদ্দিন আহমদ ঈসা খান ও স্বর্ণময়ীর চরিত্র অবলম্বনে রচনা করেন 'প্রতাপ নন্দিনী' নামক বই। এটি ১৯১৭ সালে কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। কিশোরগঞ্জের কোদালিয়া হাইস্কুলের শিক্ষক জনাব মতিউর রহমান 'দেওয়ান ঈশাখাঁ' নামে একটি গবেষণাধর্মী ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন। এটি ১৯৫১ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। ১৯৮০ সালে ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ঢাকা থেকে এর ২য় সংস্করণ প্রকাশ পায়। আনন্দনাথ রায় প্রণীত 'বারভূঞা, প্রফেসর হরেন্দ্র কুমার সরকারের 'হিরোজ অব বেঙ্গল', উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'চরিতাভিধান', অচ্যুতচরণ রায়ের 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত', যুগেন্দ্রনাথ গুপ্ত রচিত 'বিক্রমপুরের ইতিহাস', ড. এম আবদুল কাদেরের 'বাংলার বারভূঞা'র ইতিহাসের পুনর্গঠন, ড. আবদুল করিমের 'ঈসাখাঁ ও বারভূঞা পরিচিতি', হারুণ আকবরের দেওয়ান আদম খাঁ Syed Muhammed Taifoor এর Glimpses of Old Dhaka, আবুল কালাম মো: জাকারিয়ার কুমিল্লা জেলার ইতিহাস, স্যার যদুনাথ সরকার সম্পাদিত History of Bengal, Voll -2, মার্শম্যান এবং স্টেপলটনের লেখা ইতিহাসগুলোতে

ঈসা খানকে নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। ১৯৬৮ সালে কিশোরগঞ্জের লেখক মনিরউদ্দীন ইউসুফ, ঈসা খাঁ নামে একটি নাটক রচনা ও প্রকাশ করেন। ১৯৮২ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এটি পুনঃমুদ্রণ করে। এছাড়া মোঃ আবদুল হক মিয়া 'ঈশা খান' নামে ৭৪ পৃষ্ঠার আরেকটি নাটকের বই রচনা করেন, যা ১৯৬৯ সালে রাশিদিয়া লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত হয়। ড. এস. এম. হাসান রচিত 'সোনারগাঁও' নামক একটি পুস্তিকা ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত হয়। পাকিস্তানী জেনারেল এ. এ. কে. নিয়াজীর এক সময়ের ব্যক্তিগত সহকারী কিশোরগঞ্জের খয়রত নিবাসী মরহুম আবদুল মালেক খন্দকার তাঁর লিখিত 'Fall of General Niazi & Birth of Bangladesh' নামক মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিষয়ক বইয়ে ঈসা খান প্রসঙ্গ বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর বইয়ের ৬ পৃষ্ঠায়- 'Fall of General Niazi & Birth of Bangladesh' বলা হয়েছে—General Niazi's family is a traditional soldiers family. Among his forefathers only Esakhan, one of the the famous twelve Bhuiyans of Bengal could make a place for himself in the history of the country.' আবার একই বইয়ের ৬৩ পৃষ্ঠায় তিনি উল্লেখ করেছেন ''Thus General Niazi made another history for his family in the soul of Bengal only 40 miles south of Egarosindur, a place where General Esa Khan, a worthy son of his family defeated General Mansingh, the most reknowned General of the Moghal army, that was also a war of independence by winning the war in the battle field, where as General Niazi made Bangladesh independent by losing the war.'

জনাব মরহুম আবদুল মালেক খন্দকার সাহেব জেনারেল নিয়াজির প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে ভিন্ন এক ঈসা খানকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সূর্য পুরুষ ঈসা খান বলে চালিয়ে দিয়েছেন। তিনি জেনারেল নিয়াজির সামরিক বাহিনীতে যোগদান এভাবে উল্লেখ করেন- 'He was then assigned to a Rajput Regiment.' তাঁর ধারণা সম্ভবত রাজপুত হওয়ার সুবাদেই তিনি ঈসা খাঁর পূর্বপুরুষ সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকবেন। তাঁর বইয়ে আলোচিত পাকিস্তানী বাহিনীর প্রধান যিনি ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ভারতীয় মিত্রবাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আত্মসমর্পন করেছিলেন তিনি কক্ষণো বাংলাদেশের বার ভূঁইয়া প্রধান গ্রেট ঈসা খান মসনদ-ই-আলী নন। বরং তিনি শেরশাহর সময়কার ভিন্ন ঈসা খান ভারতে যাঁর স্মৃতিসৌধ রয়েছে। আমাদের আলোচ্য বারভূঁইয়া প্রধান ঈসা খান বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় জন্মগ্রহণকারী বাঙ্গালী বীর সৈনিক। জনাব আবদুল মালেক খন্দকার পরলোকগত বিধায় তাঁর এ তথ্য যাচাইয়ের সুযোগ পাওয়া না গেলেও ভ্রান্তি নিরসনের জন্য আমরা এ কথাকটি এ স্থানে পেশ করে রাখলাম।

জঙ্গলবাড়ীর সৈয়দ নাজমুদ্দিন হোসাইনের লেখা হাবেলী কাহিনী নামের একটি বই এবং একই স্থানের কিশোর কবি মাসুমের লেখা জঙ্গলবাড়ীর ইতিবৃত্ত বইয়ে ঈসা খানের

বংশের নানা কথা লেখা হয়েছে। সুসাহিত্যিক জনাব মুফাখখারুল ইসলাম ভাটির নাওয়ারা নামে একটি বই রচনা করেছেন যা ইসলামিক ফাউন্ডেশান কর্তৃক ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত হয়। ঈসা খানের যুদ্ধকৌশল সংক্রান্ত গীতি আলেখ্য এতে স্থান পেয়েছে। ১৯৭৮ সালে Mymensing District গেজেটিয়ার প্রকাশিত হয়। এতে ঈসা খান সম্পর্কে লেখা হয়েছে। খ্যাতনামা লেখক দরজি আবদুল ওয়াহাব রচিত ময়মনসিংহের চরিতাভিধান নামক বইয়েও ঈসা খান প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। মোহাম্মদ সাইদুর ও মোহাম্মদ আলীর সম্পাদনায় প্রকাশিত কিশোরগঞ্জের ইতিহাস এবং মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম সম্পাদিত কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ পত্রিকার ২য় সংখ্যায় বীর করিম এবং চৌদ্দশত নাম প্রসঙ্গ শিরোনামে ঈসা খান বংশের কথা আলোচিত হয়েছে।

১৯৯২ এবং ৯৩ সালে দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকায় কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক প্রাবন্ধিক ও গবেষক মোঃ মোশাররফ হোসেন শাহজাহান এবং দেশের প্রবীণ ইতিহাসবেত্তা ড. এম আবদুল কাদের সাহেবের ‘ঈসা খাঁ’ ও ‘মূসা খাঁ’ শিরোনামে বেশ কয়টি প্রবন্ধ ছাপা হয়। এক পর্যায়ে জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন শাহজাহানের সাথে ড. এম আবদুল কাদেরের তথ্যযুদ্ধ শুরু হলে ঈসা খান সংক্রান্ত অনেক বিতর্কিত বিষয়ে উভয় পক্ষ থেকে মূল্যবান তথ্য আসতে থাকে। ৬/৭ কিস্তিতে তথ্যযুদ্ধ চলার এক পর্যায়ে ড. এম আবদুল কাদের সাহেব মৃত্যুবরণ করলে এ বুদ্ধিদীপ্ত বিতর্কের অবসান ঘটে। সরকারি তরফে এ সময়ে ঈসা খানের তসবির (ছবি) সংগ্রহ করে তা স্মারক ডাক টিকিট হিসাবে প্রকাশ করে ও স্মারক খাম উদ্বোধন করা হয়। এ বিতর্ক চলার ফলে জনাব মোশাররফ হোসেন শাহজাহান ঈসা খান নিয়ে এতটা গবেষণায়

১৯৯২ সালে ডাকবিভাগ প্রকাশিত ঈসাখান স্মারক ডাকটিকিটের উদ্বোধনী খাম

জড়িয়ে পড়েন যে পরবর্তীতে তিনি ঈসা খান মসনদ-ই-আলা নামে একটি পূর্ণাঙ্গ বই রচনা করেন।

ঈসা খানের পরিবার বরাবরই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছে। ঈসা খানের সহযোদ্ধা পাঠানবীর খাজা উসমান সিলেটের শাসনভার হাতে নেবার পর সেখানকার মুসলমানদের মধ্যে এক উদ্ভাবিত সিলেটী নাগরী নামের ভাষার ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। সম্পূর্ণ নিজস্ব বর্ণমালায় সিলেটী নাগরী নামের এ স্বতন্ত্র ভাষাটির বিস্তার প্রধানত ও মূলতঃই মুসলিম সাহিত্য সংস্কৃতির ধারক হয়। এ ভাষায় শতাধিক পুঁথি, কিতাব ইত্যাদি লেখা হয়েছে। ঈসা খানের পুত্র মুসা খান মসনদ-ই-আলার পৃষ্ঠপোষকতায় পণ্ডিত নাথুরেশ ‘শব্দ রত্নাকরী’ নামক একখানি সংস্কৃত অভিধান রচনা করেন। ঈসা খানের পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে হয়বতনগর বাড়ির দেওয়ান ইব্রাহিম খান একজন উপযুক্ত পণ্ডিত দিয়ে সমগ্র মহাভারত অনুবাদ করিয়েছিলেন। আলি ইমদাদ খানের ব্যাক্তিগত লাইব্রেরি ছিল বিশাল। তিনি কিশোরগঞ্জ টেনিস গ্রাউন্ড এবং অফিসার্স ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা ও দাতা। দেওয়ানদের প্রদত্ত উপাধি যেমন—কারকুন, মজুমদার, বীর, গন্ধি,—কারার, ঢালী, খাঁ ইত্যাদি কিশোরগঞ্জ সহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে। অন্যদিকে দেওয়ানদের নামে বিভিন্ন স্থান ও খাল বিলের নামও হয়েছে। ইছাপুর, দেওয়ানবাগ, হয়বতনগর, চৌদ্দশত, বাহাদুরপুর, কোশাকান্দা, কুর্শা খালী, ষাইটদাঁর ইত্যাদি ছাড়াও সরকার ঈসা খান মানসিংহ যুদ্ধখ্যাত ‘এগারসিন্দুরের’ নামে ঢাকা-কিশোরগঞ্জ আন্তঃনগর এগারসিন্দুর এক্সপ্রেস ট্রেনের নামকরণ করেছেন। ঢাকা ময়মনসিংহ ঈসা খাঁ এক্সপ্রেস নামেও একটি ট্রেন চালু করেছে। ঢাকায় কাকরাইলে রাজমনি ঈসা খাঁ হোটেল নামে একটি ৫ তারা হোটেলের নামকরণ করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ঈসা খান রোড নামে এবং ঈসা খান আবাসিক এলাকা নামে আবাসিক এলাকার নামকরণ করা হয়েছে। পাকুন্দিয়া উপজেলার এগারসিন্দুরে মাওলানা এখলাছউদ্দিন সাহেব ঈসা খান মাদ্রাসা নামে একটি ফাজিল মাদ্রাসা স্থাপন করেছেন। থানারঘাট থেকে মির্জাপুরগামী সড়কটি ঈসা খান রোড নামে নামকরণ করা হয়েছে। কিশোরগঞ্জে ঈসা খাঁ নামে একটি হোটেল এবং একটি সড়কও রয়েছে। কিশোরগঞ্জ টেক্সটাইল মিলের উৎপাদিত সুতার নাম ‘ঈসা খাঁ মার্কা সুতা’। সম্প্রতি কিশোরগঞ্জে একমাত্র বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়টি ‘ঈশাখাঁ বিশ্ববিদ্যালয়’ নামে চালু হয়েছে। আল হেরা ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল নামে কিশোরগঞ্জের একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান করিমগঞ্জে ঈসা খাঁ রোডে ঈসা খাঁ পল্লী নামে আবাসিক এলাকা প্রতিষ্ঠা করেছে।

কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ ১৯৯৪ সালে ঈসাখানের বংশধরদের আবাস হয়বৎনগর হাউলিতে দিনব্যাপী সাহিত্য সম্মেলন এবং ১৯৯৯ সালে ঈসা খানের ৪০০ তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ঐতিহাসিক এগারসিন্দুর মাঠে দিবারাত্রিব্যাপী সাহিত্য

সম্মেলনের আয়োজন করে ঈসা খান চর্চায় যে নতুন যাত্রা শুরু করেছিল তা কালক্রমে দেশব্যাপী ব্যাপকভিত্তিতে ঈসা খান চর্চার পথ সুগম করে। কিশোরগঞ্জ সাহিত্য সংস্কৃতি

ঈসা খান-মানসিংহ যুদ্ধ খ্যাত এগারসিন্দুর দুর্গের দমদমা: চূড়ায় বসা এ যুগের সাংস্কৃতিক ঈসা খান কবি আলমুজাহিদী।

পরিষদ এ উপলক্ষ্যে একটি মূল্যবান স্মারকও প্রকাশ করে। ঢাকায় সলিমুল্লাহ একাডেমী কয়েকবার ঈসা খানের উপর প্রোগ্রাম করেছে। তমুদ্দুন মজলিশও ঈসা খানের উপর প্রোগ্রাম করার পাশাপাশি তাদের মত করে ঈসা খান স্মারক সংখ্যাও প্রকাশ করেছে। কিছু কিছু ভুয়া সংগঠন ঈসা খানকে নিয়ে বানিজ্য করার কুমতলবে নিজেদের ঈসা খানের বংশ সাজিয়ে রাজধানী ঢাকায় প্রোগ্রাম করার বিষয়টিও আমাদের নজরে এসেছে। এসব সামগ্রিক চর্চা ঈসা খানের বিপুল জনপ্রিয়তার প্রমাণ বহন করে।

এদেশ ও জাতি ঈসা খান নিয়ে অতীতেও গর্বিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও গৌরব করবে। মধ্যযুগের কবি এতিম কাশিম লিখেছিলেন—'বার বাংলার রাজা ঈসা খানঁ বীর/ দক্ষিণ কুলের রাজা আদম সুধীর।' তেমনি সংস্কৃত কবি শ্রী কালিহর বিদ্যালংকার ও ঈসা খানের স্তবস্তুতি গেয়েছেন—'নরসুন্দা নদী তীরে গ্রামো জঙ্গল বাটিকা।/তত্রাসিৎ পার্থিব শ্রেষ্ঠ ঈসা খাঁ বংশ সম্ভবে।।/আর্য্যশাস্ত্রার্থ তত্তস্য তদ্ব্যবহার সংসদি।/ব্যবস্থাপত্র মেতস্মাদ গৃহীত্বাহভুৎ সুনির্ণয়।।/তস্য তুপস্য বিস্তীর্ণ রাজস্থমাষ ম।লম।/তদ ব্যবস্থানুসারেন ক্রিয়াধর্ম্যাঃ সমাচারৎ।।"

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে ঈসাখান মসনদ-ই-আলাকে নিয়ে যৎকিঞ্চিৎ কাজ হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা চলচ্চিত্র পরিচালক মরহুম খান আতাউর রহমান বর্তমান প্রাবন্ধিকের ঈসা খান বিষয়ক লেখাগুলো দৈনিক পত্রিকার পাতায় পড়ে প্রীত হয়ে কবি খান মোহাম্মদ শিহাবকে পাঠিয়ে কিশোরগঞ্জ থেকে ঢাকায় এনে এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর জীবনের শেষ ইচ্ছা ঈসা খানকে নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে পারেননি। পরবর্তীতে চলচ্চিত্র পরিচালক চাষী নজরুল ইসলামও তাকে তার কবি জসীমউদ্দীন রোডের বাসায় দাওয়াত দিয়ে নিয়ে গিয়ে ঈসাখানের উপর চলচ্চিত্র নির্মাণের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। পত্রিকায় বিজ্ঞাপনও দিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উনিও আর এ কাজটি করে যেতে পারেননি। প্রবন্ধ লেখক বাংলাদেশ টেলিভিশনের জীবনধারা, নদী নিরবধি, বিনির্মাণ, ঢাকা আমার ঢাকা ইত্যাদি অনুষ্ঠানের নানা অনুষঙ্গে ঈসা খানের প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন, বেশ কয়টি এপিসোডও করেছেন; কিন্তু ঈসা খানকে নিয়ে আজ পর্যন্ত কোন ধারাবাহিক টিভি সিরিয়াল কোন চ্যানেল থেকেই তৈরি ও প্রচার করা হয়নি। স্বপ্ন সোনারগাঁ নামক একটি সিরিয়ালে কেবল এর আংশিক ছোঁয়া এসেছিল। ঈসা খানকে নিয়ে ৫২ সপ্তাহে ৫২টি এপিসোডে টিভি সিরিয়াল করা যায়। এ কাজে কেউ আগ্রহী হলে বর্তমান লেখক স্ক্রিপ্ট দিয়ে, গবেষণা দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকছে।

মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় ঈসা খান নামটি এদেশের সকল দেশপ্রেমিক জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের সতত অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। একটি স্বাধীন সার্বভৌম জাতি হিসেবে টিকে থাকতে হলে আমাদের জাতীয় জীবনে ঈসা খান চর্চা জরুরি। কাজেই আসুন আরও ব্যাপকভাবে আমরা ঈসা খান চর্চা করি এবং নতুন প্রজন্মকে বীরত্বের ঐতিহ্যে গড়ে তুলি। একটি উদার অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র গঠনের পাশাপাশি বীরের জাতি হিসেবে বেঁচে থাকতে ও সে ধারায় নিজেদের মনন গড়ে তুলতে কিংবদন্তীর অকুতোভয় বীর, বাঙ্গালীর গৌরব ঈসা খান মসনদ-ই-আলার সামগ্রিক জীবনী চর্চা ও রচনায় আমাদের সার্বিক ও সামগ্রিক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

লেখক: সাহিত্যিক, ঈসা খান বিশেষজ্ঞ, ইতিহাসবিদ

ব্য ক্তি ত্ব

রমজান আলি

অক্ষয়কুমার দত্ত : মন ও মননে

সেকালের বিখ্যাত ফ্রেনোলজিস্ট অর্থাৎ নরকরোটিক বিশারদ কালীকৃষ্ণ দাস তাঁর মাথার বেড় পরীক্ষা করে বলেছিলেন—"আই সি এ ক্রাউন অফ ইন্টেলেক্ট ওভার হিজ ফোরহেড।" উনিশ শতকের অন্যতম বাঙালি ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত, যিনি পৌরাণিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নয়, বিজ্ঞানের আবিষ্কার এবং আবিষ্কৃত সত্যের পথে অবিচল শ্রদ্ধা ও আস্থা রেখেছিলেন। মন্ত্র পড়ে ব্রহ্মধর্ম গ্রহণ করলেও ধর্ম প্রচার তাঁর কাছে বড়ো ছিল না। সমকালীন রাজনৈতিক-সামাজিক দ্বান্দ্বিকতায়, সচেতন ব্যক্তি হিসেবে তিনিও অন্যান্যদের মত সমান ক্ষত-বিক্ষত ছিলেন। রাজনৈতিক দিক থেকে তৎকালীন সময়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন ব্যবস্থায় কৃষকদের উপর অত্যাচার, নীলকর সাহেবদের শোষণ; ধর্মীয় দিক থেকে হিন্দু-ব্রাহ্ম-খ্রিস্টান ধর্মের পারস্পরিক প্রতিযোগিতা; সমাজ সংস্কারের দিক থেকে সতীদাহ প্রথারোধ, বিধবা বিবাহ চালু করা, বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ বন্ধ করা, কৌলীন্য ও জাতিভেদ প্রথা দূরীকরণ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সমাজে বেশ আলোড়ন চলছিল। শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মশাস্ত্র না বিজ্ঞান ভূগোল? কোনটা বেছে নেওয়া হবে?—এরকম একটা দ্বান্দ্বিকতায় অক্ষয়কুমার দত্ত বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের সমর্থক ছিলেন। প্রকৃতি এবং পরিবেশ নিয়ে তাঁর ছিল অপার বিস্ময়। আসলে তিনি ছিলেন যুক্তিবাদে স্নাত হিউম্যানিস্ট। অনেকেই তাঁকে বলেছিলেন, 'য়ুরোপীয় ভাব প্রচারের মিশনারী।'

বর্ধমানের চুপি গ্রামে জন্ম হলেও সেই গ্রাম্য সীমায় নিজেকে বেঁধে রাখেননি তিনি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতো পিতৃ-ইচ্ছায় কলকাতায় ইংরেজি শিখতে এসে মাত্র ষোল বছর বয়সে ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে ভর্তি হয়েছিলেন ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে। পিতা পীতাম্বর দত্তের আকস্মিক মৃত্যুতে অর্থাভাবে স্কুল ছাড়তে বাধ্য হলেও ইতিমধ্যেই হার্ডম্যানের কাছে পাঠ নিয়েছিলেন গ্রীক, হিব্রু, ল্যাটিন, ইংরেজি, জার্মান, ফরাসি ভাষা। সংস্কৃত ভাষাতেও ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এসব ভাষা শিক্ষার পাশাপাশি তিনি পদার্থবিদ্যা, ভূগোল, জ্যামিতি, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি, উচ্চ গণিত, মনোবিজ্ঞানের পাঠ গ্রহণ

করলেন। পড়ে ফেললেন জয়েসের সাইন্টিফিক ডায়ালগ, ইউক্লিডের জ্যামিতি, ক্যালকুলাস, মেকানিক্স, হাইড্রোস্ট্যাটিক, অ্যাস্ট্রোনমি, ফ্রেনোলজি ইত্যাদি। তাঁর এমন পাঠ গ্রহণের খিদে সেকালে মাইকেল মধুসূদন দত্তের সঙ্গেই একমাত্র তুলনা করা হলেও বিজ্ঞান পাঠে তিনি তাঁর থেকেও এগিয়ে ছিলেন। বেদ-বেদান্ত স্মৃতিশাস্ত্র না মানা এমন একটি মানুষকে সেই সময়ে হিন্দু সমাজের অনেকেই 'নাস্তিক' বলে ঘোষণা করেছিল। গলা ছেড়ে বলেছিল, এসব গ্রন্থ আসলে 'মানসিক রোগ'-এর ফল। গ্রিক সাহিত্য পাঠ করতে গিয়ে সেখানেও হিন্দুদের মতো দেব-দেবীর উপস্থিতি লক্ষ করেছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। ব্রাহ্মধর্মের সভায় সদর্পে ঘোষণা করেছিলেন, 'ঈশ্বর সর্বশক্তিমান নন, বিচিত্র শক্তিমান।' শুধু পরিশ্রম করলে শস্য পাওয়া যায় না। প্রাকৃতিক কারণেই শস্যের ফলন। শুধু প্রার্থনা করলেই শস্য পাওয়া যাবে, একথা ঠিক নয়। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, ধর্ম নিয়ে তাঁর যদি এতই প্রশ্ন, তাহলে তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করতে গেলেন কেন?

হিন্দুধর্মের সংস্কারগুলি ভাল লাগছিল না। এদিকে পিতার মৃত্যুর পর সংসার চালানোই তাঁর কাছে পরম ধর্ম হয়ে উঠলো। ছুটে গেলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্ববোধিনী সভায়। সভার সদস্য থাকতে থাকতেই ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে প্রসন্নকুমার ঘোষের সাহায্যে বের করে ফেললেন 'বিদ্যাদর্শন' নামের একটি মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক হিসাবে অভিজ্ঞতা লাভের পর মাত্র ২৩ বছর বয়সে মাসিক হিসাবে পত্রিকাটির সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ। তাঁর প্রবল ইচ্ছা, ব্রাহ্মসমাজের বক্তব্য তুলে ধরার পাশাপাশি, সাধারণ মানুষের জ্ঞাতার্থে ভূগোল ও বিজ্ঞানকে তুলে ধরা হবে। সাময়িকপত্রে বিদ্যাশিক্ষার প্রথম পাঠ শুরু করেছিলেন। পরম ব্রহ্মের অনুশীলনের পাশাপাশি কুকর্ম থেকে নিবৃত্ত করে মানুষের মনকে পরিশুদ্ধ করা ছিল এই পত্রিকার অন্যতম আরেকটি উদ্দেশ্য। পত্রিকাটি বিধবা বিবাহের সমর্থক এবং কৌলীন্য প্রথার সমালোচক ছিল। বাংলার কৃষক সমাজের দুরবস্থার ছবি এই পত্রিকায় তুলে ধরা হতো। কিন্তু কোনো একটা ধর্ম সমাজের মুখপত্র, এতসব আবদার মেনে নেবে কেন? ১৭৭২ শকাব্দের ১১ মাঘ সাম্বৎসরিক উৎসবে অক্ষয়কুমার বলে ফেললেন, "বেদ ঈশ্বর প্রত্যয়দিষ্ট নহে, বিশ্ববেদান্তই, প্রকৃত বেদান্ত।" প্রায় দশ বছর চালিয়ে তিনি পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্বভার ত্যাগ করলেন। পত্রিকাটি পুরোপুরি ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক পত্রিকায় পরিণত হয়ে গেল।

কোন লেখা প্রকাশ করা হবে, আর কোন লেখা প্রকাশিত হবে না এই নিয়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা একটি উপ-সমিতি গঠন করে। সেই উপসমিতির সভ্য ছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। তিনি অনেকের লেখার সঙ্গে অক্ষয়কুমার দত্তের লেখাও সংশোধন করেছেন। তখন থেকেই তাঁদের বেশি করে চেনা জানা। মনে রাখতে হবে তত্ত্ববোধিনী সভা তাঁর 'ভূগোল' (১৮৪১) গ্রন্থটি প্রকাশের উদ্যোগ নেয়।

১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘তত্ত্ববোধিনী’ পাঠশালা স্থাপন করেন। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে পাঠশালা স্থাপনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে লিখেছেন—“ইংরাজী ভাষাকে মাতৃভাষা এবং খ্রিস্টধর্মকে পৈতৃক ধর্ম রূপে গ্রহণ—এই সকল সাংঘাতিক ঘটনা নিবারণ করা, বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানশাস্ত্র এবং ধর্মশাস্ত্রের উপদেশ করিয়া বিনাবেতনে ছাত্রগণকে পরমার্থ ও বৈষয়িক উভয় শিক্ষা প্রদান করা।” অক্ষয়কুমার দত্ত এই পাঠশালার ভূগোল ও পদার্থবিদ্যার শিক্ষক নিযুক্ত হন মাত্র কুড়ি বছর বয়সে।

১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে যখন হিন্দু কলেজ শুরু হয় তখন তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজি শিক্ষার উপর জোর দেওয়া। পরে দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব প্রমুখ ব্যক্তিত্ব এই কলেজের অধীনে একটি পাঠশালা স্থাপনে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। কলেজের জমিতে ১৮৩৯ সালের ১৪ জুন ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। বাংলা ভাষার মাধ্যমে জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া এর একটা অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। দেশীয় ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি যে রিপোর্ট প্রকাশ করেন সেখানে পাঠ্যবিষয় চারটি শ্রেণিতে ভাগ করার কথা বলা হয়েছিল। কমিটি সেটাকে তিনটে শ্রেণি ধরে পাঠক্রম এইভাবে সাজায় — প্রথম শ্রেণিতে থাকবে অক্ষর, বানান, হিতোপদেশ ইতিহাস, ব্যাকরণ ও গণিতের প্রাথমিক সূত্র এবং ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। দ্বিতীয় শ্রেণিতে ব্যাকরণ, অংক, ক্ষেত্র পরিমাপক বিদ্যা, গোলাধ্যায়, জ্যোতির্বিদ্যা, শুদ্ধরূপে ভাষা কথনের বিধি, ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং পত্রলিখনরীতি। তৃতীয় শ্রেণিতে শুদ্ধরূপে ভাষাকথনের নিয়ম, জমিদারী ও বাণিজ্য সম্পর্ক ব্যবহার, প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস, জ্যোতির্বিদ্যা, বীজগণিত, রাজনীতি, নীতিবিদ্যা, ক্ষেত্র-পরিমাপক বিদ্যা, গভর্নমেন্টের আইন ও আদালতের রীতি ব্যবহার এবং হিন্দু ও মুসলমানের ব্যবস্থা। বারটি শ্রেণির জন্য ১২ জন শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। বিনামূল্যে ‘শিশু সেবধি’ পাঠ্যপুস্তক দেওয়া হল। সরকারি নীতির জন্য ছাত্র সংখ্যা কমে যাওয়ায় পরে অবশ্য ৭ জন শিক্ষক রাখা হয়েছিল। ১৮৫৪ সালের ১৫ মে হিন্দু কলেজের দুটি বিভাগ হয়—প্রেসিডেন্সি কলেজ ও স্কুল বিভাগ। কলেজের অধ্যক্ষ হলেন বিদ্যাসাগর। ১৮৫৫ সালে দক্ষিণ বঙ্গের চারটি জেলার স্কুল-ইন্সপেক্টরের দায়িত্ব নিয়ে মফস্বল বিদ্যালয়গুলির জন্য উপযুক্ত শিক্ষক তৈরির কথা ভাবলেন। শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হলেন বিদ্যাসাগর। ওই বছর ১৭ জুলাই, এই উদ্দেশ্যে নর্মাল স্কুল চালু হল। অক্ষয়কুমার দত্ত হলেন প্রধান শিক্ষক আর মধুসূদন বাচস্পতিকে করা হল দ্বিতীয় শিক্ষক। শিক্ষক রূপেও তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল ছাত্রদের বিজ্ঞানমনস্ক এবং যুক্তিবাদী করে গড়ে তোলা।

ক বি তা

মু হা ম্মা দ ও লি দ সাঁ ফু ই

অপেক্ষা

আজও আমি অবহেলিত সেই পথে
জীবনের মহীরুহে কত বীভৎস স্বপ্নের রাশি।
আঁকা বাঁকা রেখা পথে জেগে উঠি
ঝড় ভেঙে বিষাক্ত দৃষ্টির গভীরতায়।
প্রতিকূলতার কোলে ভাঙা ভাঙা ঘুম
বুঝিয়ে দেয় বিতৃষ্ণার আনন্দ।
আর সেই ছায়া পথ জুড়ে ভেসে আসে
মৃত স্বপ্নের অজস্র আর্তনাদ।
জীবন ভোগের লিপ্সা উদ্ভাসিত হয়
স্মৃতি আঁকা আধা মোড়া ক্যানভাসে।
আজও তাই হেঁটে চলি সময়ের বিপরীতে
দীর্ঘ অপেক্ষার সেই বিস্মৃত পথ ধরে ধরে।

মু হা ম্ম দ হা বী বু ল্লা হ হে লা লী

শারদ স্বপ্ন

বিবর্ণ বালুচরে কাশফুল হেলেদুলে নাচে
শরতে দুখে ধুকে মরা নদীও আশায় বাঁচে
অবসন্ন কষ্টের জলদীর্ঘ মৌনতা শেষে
দূর নীলিমা থেকে একদিন নেমে আসবে মেঘ
সাঁতার কাটবে পোড়া নদী পাহাড়ি জলের স্রোতে
এখানে অঙ্কুরিত স্বপ্নেরা বাঁচে; সবুজের আহ্বানে
সুবর্ণ প্রকৃতির চোখে নরম নিশ্বাসের আশে।

সু ব্র ত ভ ট্টা চা র্য

একদিন এসো

সুযোগ পেলে একটু সময় নিয়ে এসো রাই
একটিবারের জন্য হলেও একদিন এসো।
তোমার সাথে না বলা অনেক কথা মনের ভেতর আটকে আছে,
একটা বিশাল দীর্ঘশ্বাস ফুসফুসের ভেতর পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেছে,
যেই দীর্ঘশ্বাস তোমার দেখা পেলে বাষ্পের মতো উড়ে যাবে বাতাসে।
সুযোগ পেলে,
একটু সময় নিয়ে একদিন অবশ্যই এসো রাই
কথার ছলে তোমাকে আটকে রাখবো না,
পুরনো প্রেমের ইতিহাস জুড়ে তোমাকে প্রশ্নবিদ্ধ করবো না।
শুধু একটি কথা বলবো—
যেখানে আছো, যার কাছে আছো, কিংবা যার কাছে থাকবে,
তাকে আমার মতো অবহেলা কোরো না, ভুল বুঝে দুঃখ দিয়ো না,
তাকে মন প্রাণ দিয়ে ভালোবেসো।
সুযোগ পেলে,
একটু সময় নিয়ে একদিন এসো রাই
একটিবারের জন্য হলেও একদিন এসো।
আমি এখনো তোমাকে পাগলের মতো ভালোবাসি—এই কথাটি শোনার জন্য —হলেও
অন্তত একদিন এসো,
সুযোগ পেলে একদিন এসো রাই, শুধু একদিন এসো।
শেষ সময়ের ঘড়ির কাঁটার
দিকে তাকিয়ে এসো।।

আ জি বু ল সে খ

কবিতার স্বর্গে

চোখ বুজলে কবিতার ডাকে ভালোবেসে
বুকের ভিতর চাড়া দিয়ে ওঠে কবিতা প্রেম
হৃদয়ে, মননে, শিরায় শিরায়

প্রবাহিত হয় কবিতার ফুটন্ত যৌবন।
শূন্য আকাশে চেয়ে থাকে—
কবিতার বৃষ্টি হয়ে কখন ঝরে পড়বে?
শূন্য বুকের দহন জ্বালা মিটাবে কবির।
কবিতার জন্যই তার জন্ম
কবিতার পদতলে নিজেকে সোঁপে দিয়েছে আমৃত্যু,
অন্তিম যাত্রায় কবিতারা পৌঁছে দেবে
কবিতাদের স্বর্গরাজ্যে ভালোবেসে সানন্দে।
অপেক্ষমান কবির কলমের সৃষ্টিগুলো
সাদরে অভ্যর্থনা জানাবে মালা চন্দনে,
সৃষ্টি সুখের উল্লাসে কাটাবে কবিতাগুলো,
পূর্ণতা পাবে কবি জীবন।

মা হি রু ল ই স লা ম

কটুকথা

জীবনের অভিজ্ঞতা
বাস্তবের সাথে পরামর্শ দিতে গেলে
তুমি স্বীকার হবে!
পুনরাবৃত্তি
নিজে জড়িয়ে যাবে।
অভিজ্ঞতার ফসল নিজেই কাজে লাগাও।
তাতে জীবনে সাফল্য পাবে।
আবার অভিজ্ঞতা বাড়বে।।

নি জা মু দ্দি ন ম ণ্ড ল

চোখ

কোটি কোটি টাকা ব্যয়
আমরা দেখতে পাচ্ছি না

আলোয় চোখ ঝলসে যাচ্ছে
নিশ্চুপ চেয়ে থাকে পাথরের মূর্তি
আমরা জ্যান্ত মানুষ কান্না করি
আমার মায়ের আধ ময়লা টেরিকটের কাপড়
সুপ্ত শোক
আমি জ্যান্ত মায়ের মূর্তিতে অশ্রু ফেলি
মা প্রতিবার মুছে দেয় চোখ

মু স্তা রী বে গ ম

আমিও নারী

কতগুলো বছরের উপর দাঁড়িয়ে
আমি অভুক্ত মানুষের কান্না শুনেছি
তাই কান সাজাতে আমার কানপাশা লাগে না।
দেখে শত শত শিশুর ন্যাঙটো দৈন্য
তাই চোখ সাজাইনি কতদিন!
আমি এহাতে অন্যায়কারীর বোতাম ছিঁড়েছি
চড়িয়ে লাল করেছি তাদের পাপের গাল,
তাই চুড়ি পরিনি যুগযুগ ধরে!
বিশ্বাস করুন তবুও আমি নারী।
জানেন, ওরা আমার হাসি কেড়ে নিয়েছে
কতদিন প্রাণখোলা হাসিটার সাধ পাইনি!
ঠোঁটরাঙাতে গেলে তাই আমার হাত কাঁপে।
তবু আমি নারী।
আমার খতবিক্ষত শরীরে রক্ত ঢাকতে মিনিস্কার্ট নয়,
মোটা থান লাগে
তবুও আমি নারী।
আমি আমার মাতৃজঠরে
ভ্রূণহত্যার মিছিল দেখেছি,
আমার শরীরের ভাঁজে ভাঁজে তাই যৌনতা জাগে না।
তবুও আমি নারী।
তোমার স্পর্শ আমাকে আতঙ্কিত করে

কেননা শরীরে এখনো ধর্ষণের টাটানি।
তবুও আমি নারী।
আমি পাচার হওয়া নারী, আমি নির্যাতিতা নারী
আমাকে গলা সাজাতে হার, হাসুলি নয়।
আমার গলায় এখনো রসির দাগ।
পায়ে নূপুর পরিনি
ওখানে বেড়ি পরিয়েছিলো কারা!
তবু আমি নারী।
বিশ্বাস করুন আমার ধমনীতে
সহস্র শিশুর কান্না।
সহস্র নারীর অবমাননা, লাঞ্ছনা আর
পণপ্রথার চিৎকারে ভরিয়ে ফেলেছি আমার হৃদয়।
তবু আগুন নিয়ে খেলতে খেলতে কখনো তোমাকে দেখি। একবারের জন্য।
তোমার উন্নত বুকে মাথা রাখার সাধ হয়।
এখনো মনে হয় যদি গর্ভে ধরতাম একটি অগ্নিশিশু
অথবা আলতা পায়ে নরম দূর্বার উপরে হেটে যেতাম একটি পরিবার পথ।
হয় না। দেখা হয় না তোমায়!
ইচ্ছে করে ঘুমাই ঐ বুকে।
ভরিয়ে দি চুমায় আমার সৈনিকের মুখ।
আসলে তরবারীর আওয়াজে প্রেম আসে না।
রাজপথে ছোটা ঘোড়া দৌড়ে ব্যস্ত তাই
রাজসূয় যজ্ঞের আগুন ফুল ফোটায় না।
মেনে নাও আর না নাও...
তবু আমি নারী।

আ জ হা রু ল হ ক
বিচার

যাযাবর জীবন থেকে মাটির মোহমাখা নিগড়
মুক্তি দিয়েছিলো অনিশ্চয়তার হাতড়ানো থেকে,
রক্ত ঘামে গড়া পুঞ্জিভূত সম্পদ
সহজেই কেড়ে নিলো ব্যূঢ়োরস্ক মগ,

মগের সে মুলুকের হিসেব
শত শত যুগ পর পারাবতের শান্ত ছায়ায়
কষে যাও তুমি ঠগ।
তোমারো ইতিহাস আছে কালো
নিশুত রাত্রে তুমি অকস্মাৎ আঘাতে
ভেঙেছো শান্তির ঠুনকো ঘর,
বক্ষপিঞ্জরে তুমি লুকিয়েছো রক্ত মাখা পাঞ্জা ক্ষুরধার,
লক্ষ হৃদয় হতে কেড়ে নিয়ে স্বতন্ত্র শাসন
অদৃশ্য শৃঙ্খল দিয়ে দিয়েছো নোঙ্গর।
খবর রাখেনি তারা উন্মীলিত চোখে,
নইলে শতচ্ছিন্ন তালিমারা পাল
খুলে দিত জ্ঞানচক্ষু, বিভ্রমজাল কেটে
বেছে নিত আপন মুক্তির সনদ।

ন জ র - উ ল - ই স লা ম

সাঁতার

সৃজিত স্থাপত্যে আজন্ম চাঁদ
পটের পাখির অহংকারে দোলে অলিখিত দেহমন্তাজ
অখণ্ড উৎস সূচি পুষে মোহবেলা অদিতি খিদেয় উপুড়
লুকনো বুক অনন্তঘোর পিয়াস কারক কথায় আকুল
প্রেমের ভুবনালোকে মুখোমুখি সাঁতরাচ্ছে বরেণ্য আখ্যান
ডুব হাঁসের মজায় বিদিশা মানদণ্ড রাখে আলোবিন্দু মন
আসি না আকাশ পারে দুয়ারে সুখচর দূর-অদূর
শুধু জল ভেঙে ভেঙে পা বদলাচ্ছে আদুরে আলোকবর্ষ...

সুরের যোজনা বশে ভাঙামন জুড়ে খাঁচায় ভরে প্রজাপতি
স্থিরজলে পদ্মপাতায় আকীর্ণ দু'ফোঁটা বিনিয়োগ

হেঁটে যাওয়া জোছনায় ঠুকরে দিচ্ছে হৃদয় অভুক্ত শোক...

উ প ন্যা স

মেকাইল রহমান

কাঙালকথা

এক

বঙ্গদেশের পূর্বপ্রান্তের জেলা বালিয়া পরগণা। এই জেলার সীমান্তবর্তী মহকুমা বসিরহাট। এই মহকুমার মধ্যখানে গণরাজপুর ও ধনরাজপুর দুই গ্রাম। পাশাপাশি গ্রাম দুটি। চিরকাল গণরাজপুর হা-করে চেয়ে আছে ধনরাজপুরের পানে।

গণরাজপুরের আকাশ মুক্ত। বাতাস বিশুদ্ধ। আকাশ-বাতাসের মতো এখানকার মানুষজনের মনও বড়ো উদার। অর্থবিত্তের ব্যাপারে তারা উদাসীন। এখানে প্রকৃতি অকৃপণ। মাঠভরা সোনার ফসল। খালবিল আর পুষ্করিণীর গভীরাগভীর জলে কত মাছ! বাগানভরা নানা গাছ। তাতে কত রকমের ফল পাকড়ের সমারোহ। প্রকৃতি তার কোল উজাড় করে কৃষিজ সম্পদ দান করেছে গণরাজপুরের মানুষকে। তবে বিশ্বপ্রকৃতির যিনি সর্বাধিকারী প্রভু, তিনি দিয়েছেন দারিদ্র। অশেষ দুঃখকষ্ট। পীড়াদায়ক রোগশোক। আর যুগযুগান্তরের বঞ্চনা- লাঞ্ছনার অভিশাপে ক্লীষ্ট করেছেন তাদের ভাগ্যদেবতা। তবু তারা সুদিনের আশায় অবিচলভাবে আছে নিরীহ নীরব। একটানা শুভেচ্ছার প্রত্যাশায় তারা হা-করে চেয়ে আছে ধনরাজপুরের পানে।

পাশে ধনরাজপুর নির্বিকার। অতি কৃপণ স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তির মতো গ্রামখানি। সে চোখ বুজে ঘাড় গুজে দুর্নিবার এগিয়ে চলেছে অনির্দিষ্ট পরিণামের লক্ষ্যে। এখানকার আকাশ কালো। মুখভারী। বাতাসে বিষ। দূষিত। পাণীয় জলে আর্সেনিক। প্রাচীন অরণ্য সাবাড় করে এখানে গড়ে উঠেছে কত কল কারখানা। ফাঁকা জায়গা বলে আর কোথাও একটুও জমি পড়ে নেই এখানে। নদীর পাড়ের ইটভাটা দখল করে নিয়েছে শ্মশান পর্যন্ত। বাবুদের অট্টালিকা আর মজুত ঘরের বহর গ্রাস করেছে কবরতলা। ধনরাজপুরের মুষ্টিমেয় কয়েজনের হাতে ধন আছে বটে। কিন্তু ধনগর্বে স্ফীত হয়ে তারা এখানকার বেশিরভাগ মানুষকে মানুষ বলেই মনে করে না। মানুষের মতো মানুষ এখানে নেই বললেই চলে।

এই ধনরাজপুরের পুরানো জমিদার ছিল কাঙালরা। সাত পুরুষ আগে এই কাঙাল পরিবারের প্রপিতামহ ছিলেন মহেন্দ্র নাথ। তিনি ছিলেন দানশীল। শুধুমাত্র দানশীলতার কারণেই ফতুর হয়ে যান তিনি। চরম অনটনে পড়ে শেষ পর্যন্ত তাঁর মাথার গণ্ডগোল হয়। অতি দারিদ্রের কবলে পড়ে তিনি স্ত্রীকে পর্যন্ত টাকার বিনিময়ে ক্রীতদাসী হিসাবে

তিনি ছিলেন দানশীল। শুধুমাত্র দানশীলতার কারণেই ফতুর হয়ে যান তিনি। চরম অনটনে পড়ে শেষ পর্যন্ত তাঁর মাথার গণ্ডগোল হয়। অতি দারিদ্রের কবলে পড়ে তিনি স্ত্রীকে পর্যন্ত টাকার বিনিময়ে ক্রীতদাসী হিসাবে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হন। বিদেশী বণিক এক টাকার জোরে কিনে নেয় বিদূষীকে। এতে অবশ্য মহেন্দ্র নাথের অভাব ঘোচেনি। লালসা মেটেনি বিত্তবান বণিকেরও। মহেন্দ্র তখন গোপনে এক এক করে বেচে দেন তাঁর তিন কন্যাকেও। তাতেও সুদিন ফেরেনি তাঁর। তিনি তখন চার পুত্রকে পাঠিয়ে দেন সিংহলে। তারা আর ফেরেনি।

বিক্রি করে দিতে বাধ্য হন। বিদেশী বণিক এক টাকার জোরে কিনে নেয় বিদূষীকে। এতে অবশ্য মহেন্দ্র নাথের অভাব ঘোচেনি। লালসা মেটেনি বিত্তবান বণিকেরও। মহেন্দ্র তখন গোপনে এক এক করে বেচে দেন তাঁর তিন কন্যাকেও। তাতেও সুদিন ফেরেনি তাঁর। তিনি তখন চার পুত্রকে পাঠিয়ে দেন সিংহলে। তারা আর ফেরেনি।

অবশেষে বৃদ্ধ হতবুদ্ধি মহেন্দ্র নাথের মনে হয় তাঁর সমস্ত দুর্গতির এক ও অদ্বিতীয় অনুঘটক প্রতিস্পর্ধী ভুঁইভোড় ভুঁইয়া প্রতাপ নারায়ণ রায়চৌধুরী।

প্রতাপ করত রাহাজানি। এতে বেশ কিছু টাকা হল তার। এক সাগরেদকে দিয়ে সেই টাকায় সে ধনরাজপুরের রেললাইনের ধারে সস্তায় জমি কিনতে লাগল। এক সময় অমিল হল জমি। দূরে কাছে যেদিকে তাকায়, সে দেখে বাকি সব জমি মহেন্দ্র নাথের। তখন এক ফন্দি করে সে। সাগরেদকে দিয়ে সারা এলাকা থেকে অভাবী দুঃস্থ ভিখারিদের সে দলে দলে জোগাড় করে এনে সাহায্যপ্রার্থী করে সোজা পাঠিয়ে দিতো দানশীল জমিদার মহেন্দ্র নাথের দরবারে।

সাজানো অভাবীরা সাহায্য চায়।

আত্মপর বিচার না করে, নিজের ভবিষ্যতের চিন্তা না করে মহেন্দ্র দু-হাত উজাড় করে দান করে যান টাকা। টাকা ফুরালে সোনাদানা।

অভাবীদের ভিড় আর কমে না।

কিন্তু মানুষের অর্থ- সঞ্চয় তো আর অফুরন্ত হয় না। এক বছর যেতে-না-যেতে মহেন্দ্র নাথের সমস্ত অর্থের ও সমস্ত সোনা রুপোর সঞ্চয় ফুরিয়ে যায়।

তখন মহা সুযোগ হয় প্রতাপের। সে সাগরেদ পাঠিয়ে ন্যায্য মূল্যে মহেন্দ্র নাথের ভূ-সম্পত্তি কেনার প্রস্তাব দেয়।

মহেন্দ্র নাথ তো দানের নেশায় তখন বুঁদ। একের পর এক তিনি জমি বিক্রি করেন। সাগরেদের মারফৎ সেই জমি চলে আসে প্রতাপের হাতে।

অভাবী দরবারে হাজির হয়ে হাত জোড় করে বলে, বাবু মা মরেছে। ঘাট খরচ নাই। দয়া করেন, বাবু!

মহেন্দ্র নাথ অবিলম্বে রাজকীয় শেষকৃত্যের ব্যবস্থা করে দেন।

মেয়ের বিয়ে। দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা। ঘর পড়ে গেছে, নিরাশ্রয়ের ঘর চাই। এক জোড়া বলদ না হলে গরিব চাষির হাল অচল। অন্ন নেই। বস্ত্র নেই। কত রকমের সব দায়।

বেহুঁশ দাতা মহেন্দ্র কাউকেই ফেরান না। এবং তিনি ফতুর হয়ে যান। একেবারে কর্পদকহীন! আত্মবিস্মৃত উন্মত্ত অবস্থায় তিনি তখন রায়চৌধুরী বাড়ির কাছারিতে গিয়ে হতভম্ব হন। গণ্ডগোলের মাথায় তাঁর মন বলে, ঝাড়েবংশে বিনাশ করতে হবে প্রতাপনারায়ণকে! দিশাহীন অবস্থায় তিনি হাতের কাছে পেয়ে যান ধূর্ত প্রতাপের একমাত্র শিশুপুত্রকে। তিনি সর্বসমক্ষে প্রতাপপুত্রের গলা টিপে ধরেন তাকে শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলার জন্য।

উঠতি জমিদার প্রতাপনারায়ণ রায়চৌধুরী তখন সন্নিকটে পায়চারি করছিলেন মধ্যাহ্নের আহার সেরে। খবর শুনে তিনি লাফিয়ে উঠে বন্দুক পাড়েন।

আতঙ্কিত মহেন্দ্র নাথ আর্তনাদ করে বলেন, আমার সর্বনাশ করে চিরজীবী হবে ভেবেছে মূর্খ ধূর্ত?

প্রতাপ হুঙ্কার ছেড়ে বলে, সবাই মরবে। তবে আগে তুই মর!

এই বলে প্রতাপ এক কে গুলিতে শেষ করে ফেলে মহেন্দ্র নাথকে।

সেদিন থেকে গ্রামের লোকে মহেন্দ্র নাথের নাম দিয়েছিল মহেন্দ্র কাঙাল। কাঙালই তো! অর্থাভাবে অমন কাণ্ড ঘটাতে আর কাউকে কেউ কোনদিন দেখেনি যে!

তিন যুগ পরে মহেন্দ্র কাঙালের প্রপৌত্র বীরেন্দ্র নাথ সিংহল থেকে ধনরাজপুরে ফিরে এসে পূর্বপুরুষের ভিটের খোঁজ করতে থাকেন। গ্রামের লোক তাঁকে, অনেক হিসেব কষে, অনেক স্মৃতিসন্ধানের পরে কষ্ট করে মহেন্দ্র কাঙালের বংশধর রূপে সনাক্ত করে। তারা তাঁর নাম দেয় বীরেন্দ্র কাঙাল। নিয়তির খেলায় পূর্বপুরুষের হৃতগৌরব

পুনরুদ্ধার করেন তিনি। প্রতাপ নারায়ণ রায়চৌধুরীর জমিদারির যেমন হঠাৎ উত্থান ঘটে, তেমনি অনতিবিলম্বে তার পতন হয়।

সিংহল থেকে সৌভাগ্য নিয়ে স্বগ্রামে ফিরে এসে বীরেন্দ্র কাঙাল আপন বুদ্ধি বলে প্রভূত বিষয় সম্পত্তির অধিকারী হন। তিনি ছিলেন যেমন সৎ, তেমন পরিশ্রমী। তাঁরই হাতে আবার ধনরাজপুরের কাঙাল পরিবারের নয়া জমিদারির পত্তন হয়। তিনি জমিদার হলেন বটে। কিন্তু কালচিহ্ন বহনকারী কাঙাল উপাধিটি তিনি আর পরিত্যাগ করেননি। তিনি জমিদার হয়েও রয়ে গেলেন কাঙাল!

সেই বীরেন্দ্র কাঙালের পরবর্তী চতুর্থ বংশধর হলেন জ্ঞানেন্দ্র কাঙাল। তিনি কাঙাল পরিবারের বর্তমান প্রজন্মের বড়ো কর্তা। তিনি বড়ো জ্ঞানী ব্যক্তি। জ্ঞানানুরাগী ও জ্ঞানদাতা।

জ্ঞানেন্দ্র কাঙালের বয়স একশো ছুঁইছুঁই। তাঁর মাথার চুল এই অতিবৃদ্ধ বয়সেও একটিও পড়েনি। তবে পেকে সব সাদা। যেন এক মাথা পাটের চুল। গাত্রচর্ম সুলোল। চোখ দুটি তীক্ষ্ণ। চিরতরে বন্ধ হওয়ার আগে যেন জ্বলজ্বল করছে। দৃষ্টিশক্তি অটুট। কুড়ি বছর হয়ে গেল তিনি দাড়ি কামানো ছেড়ে দিয়েছেন। ফলে দাড়ি গোঁফের জঙ্গল ঘন হয়ে জন্মেছে তার সারা মুখ জুড়ে। বয়সে সুপ্রবীণ। রবিঠাকুরের মতো চুলদাড়ি। তাঁর আদ্যন্ত বিজ্ঞভাব।

দুই

দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টার বেশির ভাগ সময় জ্ঞানেন্দ্র কাঙালকে নিঃসঙ্গ থাকতে হয়। তাঁর তিন পুত্রের তিন তাল। কারণে-অকারণে বউমাদের সাথে গল্প গুজব করে সময় কাটানো যায় না। একমাত্র নাতি পাঁচ বছর বয়স হতে-না-হতে চলে গেছে কলকাতার মিশনে। এখন সে বিদেশে।

সিংহল থেকে সৌভাগ্য নিয়ে স্বগ্রামে ফিরে এসে বীরেন্দ্র কাঙাল আপন বুদ্ধি বলে প্রভূত বিষয় সম্পত্তির অধিকারী হন। তিনি ছিলেন যেমন সৎ, তেমন পরিশ্রমী। তাঁরই হাতে আবার ধনরাজপুরের কাঙাল পরিবারের নয়া জমিদারির পত্তন হয়। তিনি জমিদার হলেন বটে। কিন্তু কালচিহ্ন বহনকারী কাঙাল উপাধিটি তিনি আর পরিত্যাগ করেননি। তিনি জমিদার হয়েও রয়ে গেলেন কাঙাল!

এহেন জ্ঞানেন্দ্র কাঙালের এখন একমাত্র বন্ধু দামাল। সে গণরাজপুরের মুসলমান পাড়ার ছেলে। বাবার নাম আনসার। বয়স পনেরো। দামাল মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে এবার।

বিকেল বেলা দামাল প্রতিদিন স্কুল থেকে বাড়িতে ফিরে জ্ঞানেন্দ্র দাদুর কাছে আসে গল্প করতে। মাঠে গিয়ে সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে খেলাধুলো করতে তার ভালো লাগে না। বরং গল্পদাদুর সাথে সন্ধে পর্যন্ত সময় কাটাতে তার ভালো লাগে। কারণ গল্পদাদু শুধু তো আর গল্প বলেন না! দাদু খেতেও দেন।

বড়োবউমাকে তিনি হেঁকে বলেন ও বড়োবউমা, এই যে দামাল এসেছে। একে খেতে দাও। বেচারার খুব খিদে পেয়েছে।

জ্ঞানেন্দ্র দেখেন দামালের মুখটা মলিন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, মুখটা আজ এমন কালো কেন হলো রে, দামাল?

দামাল বলে, কই? না তো!

– সকালে কী খেয়ে স্কুলে গিয়েছিলি ?

– খাইনি।

–কেন ? রান্না হয়নি?

– না।

– তাই বল। এবার বুঝেছি। তা স্কুলে তো মিড-ডে মিল হয়। বলে কয়ে তো পেট ভরে সেখানে খেয়ে নিতে পারতিস! এসব কবে আর শিখবি?

– এসব আমার শেখার দরকার নেই, দাদু। একবেলা না খেলে মানুষ তা বলে মরে না। কেন আমি মাথা হেঁট করে খেতে যাবো মিড- ডে মিল? আমি তো আর ফাইভ-সিক্স-সেভেন কিংবা এইট-এ পড়ি না!

জ্ঞানেন্দ্র কাঙাল দামালের বিবেক-বিবেচনা ও সহিষ্ণুতা দেখে গর্বিত হন। আজ পাঁচ বছর ধরে ছেলেটা তাঁর কাছে আসছে। তাঁর সান্নিধ্যে সুশিক্ষা পাচ্ছে। সত্য জ্ঞানের একটা প্রভাব তার উপরে পড়বে, এটাই তো স্বাভাবিক। জ্ঞানেন্দ্র অবিলম্বে তার উদর পূর্তির জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

– বউমা! ও বড়োবউমা!

জ্ঞানেন্দ্র অস্থির ভাবে ডাক ছাড়েন।

বড়োবউমাও এসে হাজির। ডাকের উত্তর দিয়ে সে বলে, এই তো, বাবা।

–এত দেরি! দাও দাও। ওর যে ভিরমি লাগার জোগাড়।

বড়োবউমা শ্বশুরমশাইয়ের অস্থিরতার খাতিরে মৃদু হাস্য ক'রে দামালকে বলে, আয় বাবা, দামাল। খেয়ে নে দেখি।

হঠাৎ একদিন প্রথম দেখলে মনে হবে বড়োবউমা শ্বশুরমশাইয়ের হুকুমে ভাত-তরকারি এনে দামালকে খেতে দেয়। কিন্তু আদৌ তা নয়। শ্বশুর মশাইয়ের হুকুম

তালিম করতে করতে এখন এটা তার অভ্যেস হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিজে বসে সে সমাদর করে দামালকে খাওয়ায়। দামাল তাকে বড়োমা বলে ডাকে। ছেলেটার ভক্তিভরা অন্তরের ডাকে নিঃসন্তানা বড়োবউমার বুক বাৎসল্য স্নেহে ভরে যায়।

তিনতলা বিরাট বাড়ি। সদর বারান্দায় প্রশস্ত ফাঁকা জায়গা জুড়ে জ্ঞানেন্দ্র কাঙালের বৈঠকখানা। বারান্দা সংলগ্ন পুবদিকের দুটি ঘর তাঁর বসবাসের জন্য সংরক্ষিত। ঘর বারান্দায় এক লপ্তে পাতা শোবার খাট। বসার আরাম-কেদারা। ডাইনিং টেবিল-চেয়ার। সবই মজুত এখানে।

চেয়ারে বসে দামাল নিঃসংকোচে খায় আদরের আহার।

জ্ঞানেন্দ্র দাদু জিজ্ঞেস করেন, হা রে, দামাল, আজ তোর আব্বা কি সকালে বাজার না দিয়ে ভাড়ায় চলে গেল?

দামাল বলে, তাই বোধ হয় হবে। আজ ক'দিন ভোরে বেরিয়ে যাচ্ছে হাড়োয়ায় সাউদের বস্তা আনতে।

দামালের বিমর্ষভাব লক্ষ করে তার দাদু বললেন, এই সামান্য কথায় মুখ কালো করিস কেন, দাদুভাই? এটাই তো জগৎ-সংসারের নিয়ম। কেউ দেয় ভাত আর কেউ দেয় খোঁচা!

দাদু বলেন, একবার দেখা করতে বলিস তো তোর আব্বাকে। অনেকদিন আর খোঁজখবর নেওয়া হয় না তার।

কথায় কথায় দামালের খাওয়া শেষ হয়।

বড়োবউ তার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে। তারপর থালাবাটি গুছিয়ে তুলে নিয়ে সে অন্দর মহলে চলে যায়।

বারান্দার মাঝখানের দরজা সোজা বরাবর উপরে উঠে গেছে সিঁড়ি।

বড়োবউ ভিতরে ঢুকলো এবং তার সাথে সাথে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এল মেজোবউ। বারান্দায় এসে সে সোজা দামালকে জিজ্ঞেস করে, তোর পরীক্ষা কবে রে, দামাল? দিব্যি যে সময় নষ্ট করছিস ভালো!

নিরুত্তর দামাল অনাদরের খোঁচা খেয়ে মুখ কাচুমাচু করে।

দামালের বিমর্ষভাব লক্ষ করে তার দাদু বললেন, এই সামান্য কথায় মুখ কালো করিস কেন, দাদুভাই? এটাই তো জগৎ-সংসারের নিয়ম। কেউ দেয় ভাত আর কেউ দেয় খোঁচা!

মেজোবউ দামালকে ইট মেরে শ্বশুরের কাছে খেলো পাটকেল। একেই বলে টিট ফর ট্যাট'!

মেজোবউ নাক লম্বা করে যেমন এসেছিল তেমনি নাক গুটিয়ে চলে গেল ভিতরের দিকে।

বারান্দা-সংলগ্ন পশ্চিমদিকের একটি ঘর থেকে গৃহভৃত্য নফর, যেমন করে গর্ত থেকে ইঁদুর-ছুঁচো ফুড়ুৎ করে বেরিয়ে এক পলকে একবার এদিক-ওদিক ফালুক-ফুলুক ক'রে তাকিয়ে অদৃশ্য হয় তেমন করে, বারান্দার গেট দিয়ে নেমে উধাও হয়ে গেল।

এবার শুরু হয় বৈকালিক বৈঠক।

জ্ঞানেন্দ্র কাঙাল দামালকে প্রশ্ন করেন। দামাল উত্তর দেয়। বিষয় বাঁধা প্রশ্নোত্তরের খেলা চলে প্রতিদিন। এটা প্রায় ক্যুইজের মতো। দামাল উত্তর দিতে না পারলে দাদু উত্তরটা বলে দেন। এছাড়া দাদু জ্ঞান বুদ্ধির কথা বলেন। সেসব শুনে দামালের কিশোর কৌতূহলী মন উদ্দীপিত হয় জ্ঞানান্বেষার নেশায়। সত্যিই একটা নেশার মতো ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে দাদু-নাতি র এই বৈকালিক বৈঠক।

দাদু বলেন, আজ আমাদের কোন্ বিষয়ের আলোচনা আছে, দামাল?

দামাল জানায়, আজ বিষয় রবীন্দ্রনাথ।

—পড়ে এসেছিস তো?

— যতটা পেরেছি ততটা।

— আচ্ছা বেশ। বল তো দেখি, ইতালিতে রবিঠাকুর কার সাথে সাক্ষাৎ করেন?

— রোঁমা রোলার সাথে।

— সাল?

—১৯২৬

— চমৎকার! ভাই দামাল, আজ শুরুতেই করলি কামাল। আচ্চা, এবার বল তো বার্লিন কোন্ দেশের রাজধানী?

দামাল নিমেষে অনায়াসে বলে দেয়, জার্মানির। হিটলারের দেশ।

জ্ঞানেন্দ্র দাদু খুবই খুশি। উৎফুল্ল চিত্তে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে কল্পনার পাখা মেলে এক পলকে যেন চলে যান জার্মানির বার্লিনে। তিনি পরের প্রশ্ন করেন, এই বার্লিনেই রবিঠাকুর এক জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। বল তো কে সেই বিজ্ঞানী।

দামাল অনায়াসেই বলে, আইনস্টাইন। সালটা বলবো কি?

—বল।

—১৯৩০।

—বুঝেছি। বুঝেছি! রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি। তাই তাঁর সম্পর্কের তথ্যগুলো সব মগজে গেঁথে নিয়েছিস। ভালো। খুব ভালো! এবার দুটো প্রশ্ন আর করবো। যদি উত্তর দিতে পারিস তবে বুঝবো তোর মগজের জোর আছে।

জ্ঞানেন্দ্র দাদু এভাবেই উস্‌কে দেন দামালের জ্ঞানস্পৃহা।

দামাল গর্বস্ফীত হয়ে বলে, বলেন না দেখি। যত কঠিন প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আপনার জানা আছে, তা ধরেন আমাকে।

দাদু দাড়িতে ডান হাতের পাঁচ আঙুল খেলালেন। নড়েচড়ে বসলেন আরাম-কেদারায়। আশঙ্কা করলেন তিনি দামালের কণ্ঠে অহংকারের সুর শুনে।

দামাল উত্তেজিত, অস্থির হলো। বলল সে, কী হলো, দাদু? নিজেই দেখছি ভুলে বসে আছেন প্রশ্ন!

তাকে সতর্ক করে দাদু বললেন, দ্যাখ দামাল, এমন ভাব করছিস, তাতে মনে হচ্ছে যে, তুই যেন সবজান্তা। কিন্তু মনে রাখিস, আগেও বহুবার তোকে বলেছি, 'অ্যা লিট্‌ল লার্নিং ইজ অ্যা ডেনজারাস্ থিং'! অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী! আমি তো জানি তোর জ্ঞানের কত দূর দৌড়!

অমনি চুপ্‌সে গেল দামালের অহমিকার ফানুস। আত্মধিক্কার ও আত্মসংযমে অবনত মস্তক হল সে।

বেশ কঠিন একটা প্রশ্ন দামালকে করবার অভিপ্রায়ে জ্ঞানেন্দ্র কাঙাল রবীন্দ্রজীবনে মগ্ন হয়ে যান। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি। ওরিয়েন্টাল সেমিনারি। নর্ম্যাল স্কুল। বেঙ্গল একাডেমি। সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল। ঠাকুর বাড়ির শিশুনিকেতন। জানালা দিয়ে দেখা সেই পুকুর, সেই প্রাচীন বটবৃক্ষ! কবিতার খাতা। জ্যোৎস্নালোকিত ছাদ। গানের আসর। নাটকের মহড়া। কাদম্বরী বৌঠান। শিলাইদহ। পদ্মার বোট। ইংল্যাণ্ডে উইলিয়াম বাট্‌লার ইয়েটস্-এর সান্নিধ্যে 'গীতাঞ্জলী'র ইংরেজি অনুবাদ। ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো। জগদীশচন্দ্র বসুর বন্ধুত্বের খাতিরে এক-একটা গল্প। কবির শান্তিনিকেতন। মাত্র বাইশ বছর বয়সে অর্ধেক বয়সের ভবতারিণীর সাথে বিয়ে। কালী প্রসন্ন কাব্যবিশারদ, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ও দ্বিজন্দ্রলাল রায়ের

তাকে সতর্ক করে দাদু বললেন, দ্যাখ দামাল, এমন ভাব করছিস, তাতে মনে হচ্ছে যে, তুই যেন সবজান্তা। কিন্তু মনে রাখিস, আগেও বহুবার তোকে বলেছি, 'অ্যা লিট্‌ল লার্নিং ইজ অ্যা ডেনজারাস্ থিং'! অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী! আমি তো জানি তোর জ্ঞানের কত দূর দৌড়!

বিরূপ সমালোচনা। তাঁর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগদান। রাখীবন্ধন উৎসব অনুষ্ঠান। ‘নাইট’ উপাধি ত্যাগ। যেন স্মৃতির স্রোতধারায় আপাদ মস্তক আলোড়িত হন জ্ঞানেন্দ্র কাঙাল।

দামাল গম্ভীর হয়ে বসে।

দাদু বললেন, আচ্ছা বল তো, দামাল, রবিঠাকুরের প্রথম প্রকাশিত কবিতা কোন্‌টি।

দামাল গম্ভীর মুখে বলল, ‘হিন্দু মেলার উপহার’।

দাদুর চক্ষু চড়কগাছ। এতক্ষণে সত্যি সত্যি তাজ্জব হলেন তিনি। ভাবলেন, দামাল তাহলে তো বেশ ভালো করেই পড়েছে জেনেছে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে! তিনি উচ্ছ্বসিত উৎসাহে দামালকে বলেন, এবার কবির প্রথম প্রকাশিত ছোটোগল্প ও উপন্যাসের নাম দুটো বলতে পারলে আজকের মতো খেলা শেষ। বল তো দেখি!

দামাল বলল, ছোটোগল্প ‘ভিখারিণী’ আর উপন্যাসটি হল ‘করুণা’। দুটোই ঠাকুর বাড়ির পত্রিকা ‘ভারতী’- তে প্রকাশিত।

দামালের অনায়াস সাফল্যে প্রফুল্ল হয়ে জ্ঞানেন্দ্র কাঙাল হাসতে-হাসতে কাশতে-কাশতে, এই একশো বছর বয়সেও, এক্কে ঠেলায় ইজি চেয়ার থেকে ঠেলে উঠে, সোজা দাঁড়ালেন, টেবিল আঁকড়ে চেয়ারে বসা, দামালের সামনে। দুহাত তুলে তাকে আহ্বান করলেন উঠে দাঁড়াতে। তারপর দু জন দুজনকে জড়িয়ে বিষম বয়সের দুই কিশোরের সে কী কোলাকুলি!

জ্ঞানেন্দ্র বললেন, আমি জ্ঞানের কাঙাল। সারা জীবন সত্যকে জেনেছি। সত্যকে জানিয়েছি। শেষ বয়সে তোকে পেলুম যোগ্য শিষ্য রূপে। জীবন আমার সার্থক।

দামাল বলল, আমার বংশ-পরিচয় উজ্জ্বল নয়। বড়োমুখ করে বলার মতো কিছু নেই। কিন্তু আপনাকে পেয়ে আমার সব অভাব মিটে গেছে। আমার দাদু পাশে থাকলে আমি বিশ্বজয় করতে পারবো!

জ্ঞানেন্দ্র বললেন, সবই মহাজ্ঞানের মহিমা! রক্তের সম্পর্কটাই কি আর সব? জ্ঞানের সম্পর্কই আসল।

সন্ধে নেমে এল।

দাদু বললেন, এবার তোকে চলে যেতে হবে। এই বিদায়টা বড়ো ব্যথাতুর। দিনরাত অষ্ট প্রহর যদি তোকে আমি আমার ছত্রচ্ছায়ায় রাখতে পারতুম তবে সবচেয়ে ভালো হতো রে, দামাল! তোকে ছাড়তে মন চায় না রে!

দামাল বলে, তা বললে তো হবে না, দাদু। আপনিই তো বলেছেন, ছাড়তেও হবে, আবার ধরতেও হবে!

দাদু বললেন, তা বটে। তা বটে।

দামাল উঠল। বলল সে, যাই, দাদু। বাড়ি গিয়ে পড়ব এবার। কাল আবার দেখা হবে। কাল বিষয় কিন্তু কাজী নজরুল ইসলাম।

নফর ঘুরে টুরে ফিরে এল। সে ফোড়ন কাটলো, আর একটু থেকে গেলে হতো না জ্ঞান সাধক পাকারাম!

দামাল তার কথায় কর্ণপাত করে না। বারান্দা থেকে নেমে সে এক ছুটে পৌঁছে যায় তাদের গণরাজপুরের কুঁড়েতে।

তিন

সেবার দামালকে কেন্দ্র করে কাঙাল পরিবারে বেধেছিল বড়োসড়ো গণ্ডগোল।

দামাল তখন প্রাইমারি স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে হাই স্কুলে পা দেবে। ফাইভে ভর্তি হবে। ভর্তি-ফি আর দেড়শো টাকা। সঙ্গে দরকার স্কুলের ইউনিফর্ম ও সরকারি পাঠ্যপুস্তকের অতিরিক্ত অন্য কিছু পার্শ্বপুস্তক। সাকুল্যে অভাব পাঁচ-ছশো টাকার।

দামালের আব্বা বলল, আমার হাত একদম ফাঁকা।

তার মা বলল, সব দায় কি আমার ঘাড়ে? আমি কি টাকার দরকারে বাজারে যাবো?

আনসার বলল, দ্যাখো তুমি।

জ্ঞানেন্দ্র কাঙালের দানধ্যানের মহিমা-কাহিনি চারিদিকে ছড়ানো। তাঁর কাছে সাহায্য চাইতে এসে কেউ খালি হাতে ফেরে না!

দামালের মা গণরাজপুর ও ধনরাজপুরের দ্বিভাজক পাকা রাস্তা পেরিয়ে সোজা চলে এল জ্ঞানেন্দ্র বাবার কাছে।

জ্ঞানেন্দ্র কাঙালের দয়া হল। তিনি দামালের ভর্তি, ইউনিফর্ম ও পুস্তকাদি ক্রয়ের সমুদয় ব্যয়ভার বহন করলেন। অধিকন্তু দামালের মাকে তিনি এও বলে দিলেন যে, যে কোনো আপদে-বিপদে সে যেন বিনা সংকোচে তাঁর কাছে চলে আসে।

দামালের আব্বা আনসার উনপাজুরে। ভ্যান চালায়। কিন্তু সংসার চালাতে পারে না। অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের অভাব। জীবন ভরা দুঃখ কষ্ট।

এই বারোমাস্যা শুনে জ্ঞানেন্দ্র কাঙালের অন্তঃকরণ দয়ায় করুণায় বিগলিত হয়। তিনি সমব্যথী হয়ে পড়েন এবং তিনি দয়াপরবশ হয়ে বলেন, দামালের দায়িত্ব এই বৃদ্ধ কাঙালের!

সেই থেকে কাঙাল দাদুর কাছে দামালের সব পেয়েছির ঠিকানা। সে যা চায়, তাই পায়।

বই বওয়ার পিঠব্যাগ। পায়ের জুতো। শীতের সোয়েটার। বর্ষার ছাতা। ক্ষুধার অন্ন। হতাশার ভরসা। দামালকে সবই দিয়ে আসছেন তার জ্ঞানেন্দ্র দাদু।

কিন্তু নগদ টাকা তো দাদুর কাছে থাকে না।

ধন সম্পদ সব তাঁর সেজো ছেলে ধনেন্দ্রর জিম্মায়।

দামালকে কিছু দেবার হুকুম হলেই ধনেন্দ্র জ্বলে-পুড়ে মরে যায়। দামালকে দেখে সে দাঁতে দাঁত কামড়ায় ক্রোধে। কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু বলতে পারে না সে বাবার ভয়ে।

এমন অবস্থায় একদিন বিকেল বেলা উঠল আয়লার ঝড়। সে কী প্রবল ঝড়! দক্ষিণের বঙ্গোপসাগর থেকে ঘূর্ণিপাক খেয়ে গর্জনশীল আয়লা সমগ্র সুন্দরবন এলাকা তছনছ করে দিয়ে এসে আছড়ে পড়লো বসিরহাট-বাদুড়িয়া-বনগাঁয়। উঠোনের কুলো উড়ে গিয়ে বিঁধলো নারকেল গাছের মাথায়। ধনরাজপুরের ইট ভাটার চিমনি সব ধরাশায়ী হলো। মোটর গাড়ি পাল্টি খেয়ে তার চাকা হয়ে গেল আকাশমুখো। জলকরের মাছ পর্যন্ত ঝড়ের ঝাপটায় উঠে এল ডাঙায়। গণরাজপুরের গাছপালা সব চুরমার হলো। খড়-টালি-টিনের চালের দু'চালা-চারচালা কুঁড়েঘর সব ভেঙে ধ্বসে চাল উড়ে ছারখার হলো।

গণরাজপুর থেকে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ দলে দলে ধনরাজপুরের কাঙাল বাড়িতে, সম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছে এবং কল-কারখানার মালিকদের সামনে হাজির হলো সাহায্যপ্রার্থী হয়ে।

জ্ঞানেন্দ্র কাঙাল তাঁর তিন ছেলেকে নিয়ে ত্রাণ সভায় বসলেন। তিনি বললেন, থাক ধন যাক মান।

প্রেমেন্দ্র তাঁর বড়ো ছেলে। সে বলল, এখন দীর্ঘ সভার সময় নয়। মানুষ অসহায়। সর্ব প্রকারে ত্রাণ বিলি করা চাই।

ছোটো ছেলে যশেন্দ্র বলল, এই দুর্দিনে মানুষের পাশে না দাঁড়াতে পারলে বীরেন্দ্র কাঙালের বংশের দুর্নাম হবে। তা আমাদের কারো কাম্য নয়।

তীব্র প্রতিক্রিয়া করে শেষে ধনেন্দ্র বলল, এই মূর্খের স্বর্গে আমি বড়োই বেমানান। যারা

দক্ষিণের বঙ্গোপসাগর থেকে ঘূর্ণিপাক খেয়ে গর্জনশীল আয়লা সমগ্র সুন্দরবন এলাকা তছনছ করে দিয়ে এসে আছড়ে পড়লো বসিরহাট-বাদুড়িয়া-বনগাঁয়। উঠোনের কুলো উড়ে গিয়ে বিঁধলো নারকেল গাছের মাথায়। ধনরাজপুরের ইট ভাটার চিমনি সব ধরাশায়ী হলো। মোটর গাড়ি পাল্টি খেয়ে তার চাকা হয়ে গেল আকাশমুখো। জলকরের মাছ পর্যন্ত ঝড়ের ঝাপটায় উঠে এল ডাঙায়। গণরাজপুরের গাছপালা সব চুরমার হলো। খড়-টালি-টিনের চালের দু'চালা-চারচালা কুঁড়েঘর সব ভেঙে ধ্বসে চাল উড়ে ছারখার হলো।

গণরাজপুর থেকে ত্রাণের আশায় এসেছে তারা গরিব মানুষ। তারা আয়লার কবলে দুর্দশাগ্রস্ত। এ কথা ঠিক। কিন্তু এটাও ঠিক যে, তারা সবাই মেহনতী মানুষ। সারা জীবন পরিশ্রম না করলে তাদের দিন কাটে না। আয়লা একটা সাময়িক প্রাকৃতিক দুর্যোগ। কিন্তু এখন তো আর ঝড় নেই। ঝড় থেমে গেছে। এই তো রোদ ঝলমল করছে। পরিবেশ একেবারে শান্ত। তাছাড়া সরকার আছে। আপতকালীন পরিষেবার কেন্দ্র তো গ্রাম-পঞ্চায়েত আর বি. ডি. ও. -অফিস।

জ্ঞানেন্দ্র হতবাক হয়ে বলল, আমরা ধনরাজপুরের পুরোনো জমিদার। আমরা কিছু করবো না ওদের জন্যে?

ধনেন্দ্র বলল, হ্যাঁ, আমরা একটু কিছু তো করতেই পারি। ওরা যদি কাজ চায়, তো কাজ দিতে পারি।

— মানে?

— মানে ফাউ ওরা কিছু পাবে না। সরকারও ফাউ তো কাউকে কিছু দেবে না। দেবে ভোটের জন্যে। তাহলে আমরাই-বা কেন কিছু ফাউ দেবো? ওরা দলবেঁধে আসুক ঝুঁড়ি-কোদাল নিয়ে। মাটি কাটুক। টাকা দেবো। ওরা শ্রমজীবী। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পরিশ্রম করে জীবিকা অর্জন করুক।

— এটা তোমার কেমন ধারা কথা হলো, ধনেন্দ্র? সব কিছু তোমার জিম্মায় দিয়েছি। তোমার দাদা দায়িত্ব নিলো না। যশেন্দ্র বিবাগী। তাই বলে তুমি এতটা নির্দয় হবে?

ধনেন্দ্র বলল, আমার যা বক্তব্য, তা আমি বলে দিলাম, বাবা। এর বাইরে আপনারা তিন জন মিলে ভিন্ন কিছু যদি সিদ্ধান্ত করেন, তবে তাতে আমার সম্মতি থাকবে না। আমার তো কাজ না করলে চলে না। এবার আমাকে যেতে হবে।

কারো কোনো অনুমতির তোয়াক্কা ধনেন্দ্র কখনো করে না। সে তার মোটরকার নিয়ে হুস করে বেরিয়ে গেল আয়লা বিধ্বস্ত কর্মক্ষেত্রে।

জ্ঞানেন্দ্র নিরুপায় হয়ে প্রেমেন্দ্রর পানে তাকালেন, প্রেমেন্দ্র, এবার বলো কী করবে!

প্রেমেন্দ্র বলল, তাই তো, বাবা। কী বলি এখন আমি?

জ্ঞানেন্দ্র বললেন, যশেন্দ্র, আর যে বংশমর্যাদা থাকে না, বাবা!

যশেন্দ্র উদাস নয়নে বিহ্বল হলো।

গণরাজপুরের জনতা এসে এসে ব্যর্থ ফিরে গেল।

জ্ঞানেন্দ্র, প্রেমেন্দ্র ও যশেন্দ্র কারো কিছু করার থাকলো না।

তারপর এল দামাল। সঙ্গে তার আব্বা, মা ও ছোটোবোন মহিমা। আয়লায় তাদের পুরো পরিবারটাই হয়ে গেল অনাথ।

দামাল বলল, দাদু! দাদু গো!

বেলা তখন আন্দাজ সাড়ে আটটা-ন'টা।

দামাল জানে এই সময়ের মধ্যে ধনেন্দ্র বেরিয়ে যায়। ধনেন্দ্র যে তাকে আদৌ সহ্য করতে পারে না! তাহলে তার উপস্থিতিতে সে কী করে আব্বা-মা-বোন কে এনে দায় জানাবে?

বারান্দাতে ইজি-চেয়ারে বসে ছিলেন জ্ঞানেন্দ্র কাঙাল। তিনি বললেন, আয় রে, দামাল। উঠে আয়। কাল থেকে আমি তোর কথাই ভাবছি। আয়লার পর দু'দিন কেটে গেল। তুই এলি না। কোনো খবরাখবর পেলাম না। আয়। আয়!

উঠোনে দাঁড়িয়ে আনসার, তার স্ত্রী ও মহিমা- ইতস্তত করছে দেখে, জ্ঞানেন্দ্র তাদেরও ডাকলেন, এসো, আনসার। তোমরাও উঠে এসো। বোসো।

তারা তিনি জন হাউমাউ করে কেঁদে উঠল।

দামাল চোয়াল শক্ত করলো বটে। কিন্তু সমূহ বিপন্নতায় ছল ছল তারও দু'চোখ। হাজার হোক, ছোটো ছেলে তো!

কান্নার আওয়াজ শুনে সারা বাড়ির লোক এক জায়গায় হয়ে গেল।

জ্ঞানেন্দ্র কাঙাল তখন আর কারো মুখাপেক্ষী হলেন না। হুকুম করে প্রেমেন্দ্র ও যশেন্দ্রকে দিয়ে দামালদের দু'চালাটা সদ্য দাঁড় করিয়ে দিলেন। ভাঁড়ার থেকে বের করিয়ে এক বস্তা চাল দিয়ে পাঠালেন। সেজো বউমাকে চোখ দেখিয়ে তার আলমারি থেকে নগদ এক হাজার টাকা, দশটা একশো টাকার নোট, দিয়ে পাঠালেন তিনি যশেন্দ্রকে দিয়ে আনসারের হাতে।

পরিত্রাণ পেয়ে হাসি ফুটলো একটা পরিবারের মুখে।

কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রকে মর্মাঘাতে প্রায় কাঁদিয়ে ছাড়লো নচ্ছার ধনেন্দ্র। দু'দিন সে প্রচণ্ড কলহ-বিবাদে সারা বাড়ি মাথায় করে রাখলো।

এরপর দামাল হল তার চক্ষুশূল!

দামালকে কেন্দ্র করে গোটা কাঙাল পরিবার দ্বিভাজিত হয়ে গেল। পিতা জ্ঞানেন্দ্র দামাল বিহনে একদিনও তিষ্ঠাতে পারেন না। তাঁকে অনুসরণ ক'রে দুই পুত্র প্রেমেন্দ্র ও যশেন্দ্র দামালের প্রতি অনুরক্ত হল স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে। এই দলে সহজে ভিড়লো বড়োবউ ও ছোটোবউ।

কিন্তু দামালকে বৈরী-বেড়াজালে ঘিরল ধনেন্দ্র, সেজোবউ ও ধনেন্দ্রর তল্পিবাহক নফর।

(ক্রমশ)

পাতাউর জামান

একটি প্রেমের গল্প লেখার জন্য অনুরোধ

এত লম্বা ফ্লাইওভার সম্ভবত কোলকাতায় এই প্রথম। যেমন আয়াতনে তেমন উচ্চতায়। সরকার নির্মিত কোয়াটারের পাঁচতলার জানালা ঘেঁসে চলে গেছে। কেউ বুঝতেই পারবে না ওটা জানালা না অন্য কিছু। যখন থেকে এই ফ্লাইওভার শুরু হয়েছে, আমি তারাতলা রোড ছেড়ে, যেটা দিয়ে দীর্ঘদিন কাগজের অপিসে যাতায়াত করতাম, এই ফ্লাইওভারের রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে শুরু করেছি। বসুদা বলেছিল, এই তো বাঙালির দোষ। নতুনটা পেলে পুরাতনকে ভুলে যায়।

খবরের কাগজে ফিচার লেখার একটা মস্ত সুবিধে আছে, সে আমি লিখতে পারি আর না পারি নানান প্রতিষ্ঠান থেকে ক্রমাগত ডাক আসে। অনবরত ফরমায়েসি লেখা দিতে হয়। সাহিত্য সভা-টভাতে যেতে হয়। এতেও কিন্তু আমি সমস্যায় পড়ি। কেউ ডাকলে গেলেও সমালোচনা, আবার না গেলেও সমালোচনা। গেলে বলে — জামান সাহেবের আজ কাল কী বাজার দর কমে গেছে, যে আতি-পারিরা ডাকলেই দুম উঁচিয়ে ছুটতে হবে। আর না গেলে — কী অহংকারী হয়ে গেছে লোকটা। পা মাটিতে পড়ছে না।

সেদিন পত্রিকায় বসুদার সঙ্গে আড্ডা দিতে দিতে এই সব কথা হচ্ছিল। বসুদা সব সময় কথা এড়িয়ে বলত, দ্যাখ জামান, আমি তোমাকে কবিতা ছেড়ে গদ্যের দিকে আসতে বলেছিলাম। বলেছিলাম তার নিশ্চয় কিছু কারণ ছিল। সব সময় সমালোচকদের কথা শুনবে না, বিশেষত ফেকু মাস্টার সমালোচকেদের। ওদের না আছে নন্দনবোধ, না আছে পড়াশুনো। শুধু ডি এ বাড়ালো কী না কিংবা প্রমোশন পাওয়ার জন্য একাডেমিক লেখা।

বসুদার সেদিনের কথায় আমি কোনোরকম উত্তর দিতে পারিনি। কারণ আমিও এককালে কলেজে পার্ট টাইম মাস্টারি করেছি। একেবারে যে বসুদার কথা গুলো উড়িয়ে দেবার, তা কিন্তু নয়।

কিন্তু আজ যখন, সেই বসুদাই রোববারের পাতার জন্য আমাকে একটি প্রেমের গল্প লিখতে বলে, তখন আমি ঘাবড়ে গেছিলাম। ঘাবড়ে গেছিলাম এই কারণে যে এর আগে আমি কখনো গল্প লিখিনি, তা নয়। ফিচার লিখেছি, রিপোর্টিং করেছি। কিন্তু প্রেমের গল্প লিখবার বেলায় বারংবার আমি ফেল করেছি। এর আগে যে চেষ্টা করিনি, তাও নয়। কিন্তু যেটা হয়েছে, হয় বাস্তব ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা অথবা রূপকথার মতো অলৌকিক কিছু ঘটনা ঘটেছে আমার গল্পে। লিটল ম্যাগাজিন সে সব লেখা ছাপত। বসুদাকে দেখিয়েছিলাম দু'একটা। বসুদা বলেছিল, কী সব ছাইপাস লিখছো। এ দেখছি - ডিটেলিং অব রিয়ালিটি আর টোটাল ফ্যান্টাসি। ইমোশন কই? টানটান উত্তেজনা কই? একটু মাখো মাখো শরীর কই? তোমার ওই 'যাহা দেখিয়াছো, তাহাই লিখিয়াছো' গোছের বর্ণনা পাঠক খাবে না। একটু চাটনি দাও, ঠিক খাবে। একটু ব্রা প্যান্টি দেখাও, খুব দেখবে। একটু অন্ধকার দেখাও, খুব ডুববে। একটু আলো দেখাও, খুব জ্বলবে। তবেই না পাঠক খাবে। তা না হলে কাগজ বিক্রি...

বসুদা বলেছিল, কী সব ছাইপাস লিখছো। এ দেখছি - ডিটেলিং অব রিয়ালিটি আর টোটাল ফ্যান্টাসি। ইমোশন কই? টানটান উত্তেজনা কই? একটু মাখো মাখো শরীর কই? তোমার ওই 'যাহা দেখিয়াছো, তাহাই লিখিয়াছো' গোছের বর্ণনা পাঠক খাবে না। একটু চাটনি দাও, ঠিক খাবে। একটু ব্রা প্যান্টি দেখাও, খুব দেখবে। একটু অন্ধকার দেখাও, খুব ডুববে। একটু আলো দেখাও, খুব জ্বলবে। তবেই না পাঠক খাবে। তা না হলে কাগজ বিক্রি...

আমি আর বেশি কিছু শুনিনি। বসুদার ওই একটা স্বভাব। একটা কিছু বিষয় পেলে বকবক করা। মানুষটা কিন্তু ভালো। ল্যাপটপটা ব্যাগে গুছিয়ে, ডেস্কে ছড়ানো কাগজ কাটিং ছাড়াও আরো কিছু টুকি-টাকি সরঞ্জাম গুছিয়ে ডেস্কের নীচের ড্রয়ার

টেনে ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে উঠে পড়ি। তখনও পর্যন্ত বাসুদা বকবক করেই চলেছে। আমার দিকে তাকিয়ে, কী হে জামান উঠলে নাকি?

আমি মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানিয়ে বাইকের চাবি খুঁজছিলাম। এই একটা হ্যাপা! আমি প্রত্যেক দিন হারিয়ে ফেলি চাবিটা। বসুদা বলেছিল, আজ আবার নাকি!

আমি মিটিমিটি হাসছিলাম। স্মার্ট ফোনটা পকেট থেকে বের করে, স্ক্রিনের উপর ম্যাজিকের স্টেজে ম্যাজিসিয়ান যেভাবে হাত ঘোরায় কোনো কিছু ভ্যানিস করার জন্য, তেমন করে হাত বুলিয়ে ফোনটা আনলক করি। স্ক্রিনে তখন সাতটা পাঁচ। ফ্ল্যাস লাইট জ্বালিয়ে ডেস্কের নিচে একবার খুঁজে দেখতে গিয়ে চাবিটা পেলাম না। উপরন্তু কিছু পুরাতন কাগজের কাটিং, নিচে, আমার হাতের কিছু মন্তব্য করা ছিল, সেগুলো পেলাম। তখন আমার চোখ বোলানোর সময় ছিল না।

ফোনে শুধু সাতটা পাঁচ হয়নি, বৌয়ের সাতটা মিসকলও ছিল। কাগজগুলো ব্যাগের পাশের চেন টেনে ওর ভেতরে চালান করে দিই।

বসুদা এতক্ষণ আমার কিউবিক্যাল রুম থেকে সরে এসে দরজার পিছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার কীর্তিকলাপ দেখছিল। আর মনে মনে হাঁসছিল বোধ হয়। আর থাকতে না পেরে বলে, জামান চাবিটা দেখ তোমার ডেস্কের পাশে যে আংটা আছে, যেখানে তুমি রোজ রোজ রাখ, ওখানেই ঝোলানো আছে।

আমি একটু লজ্জিত এবং বিব্রত হই বটে। কিন্তু মুখে কৃত্রিম রাগ এনে বলি, এটা তোমার অন্যায়। তুমি প্রথম থেকে দেখছ চাবিটা ওখানে টাঙানো আছে, তবে আগে বলোনি ক্যানো!

আসলে দেখছিলাম জামান তোমার দৌড়। যখন সবাই ফেল করে, তখন এই বসুদাই কাজে লাগে। আমি থ্যাঙ্কস্ না জানিয়ে বলি, বসুদা, ইউ আর গ্রেট। বসুদা হাত নাড়িয়ে বলে, জানি জানি।

আমি যাবার জন্য সব গুছিয়ে রেড়ি। বসুদাও তার কিউবিক্যাল রুমে চলে গেছে। আমাদের অফিসের স্টাকচারটা মর্ডান জ্যামিতির মতো চৌকো। আয়তক্ষেত্রের দু'হাজার স্কায়ার ফুটের মধ্যিখানে তিন ফুটের মতো রাস্তা। আর রাস্তার দুদিকে স্টাফদের জন্য কিউবিক্যাল রুম। আমার রুমের রাস্তার ওপারেই বসুদার রুম। আমাদের অপিসের সম্পর্ক ঠিক ফ্ল্যাট বাড়ির মতো। সবাই সবাইকে হাই হ্যালো করি। কিন্তু নাম জানি না ধাম জানি না। অথচ যেন কত পরিচিত। কিন্তু বসুদার ব্যাপারটা আলাদা।

কিউবিক্যাল ছেড়ে বের হব, বাসুদা বলে, প্রেমের গল্পটা কিন্তু মাথায় রেখ। রোববার যাবে। কাল শুক্রুবার গুডফ্রাইডের ছুটি। শনিবারে কম্পোজে যাবে। রোববার কিন্তু নো পলিটিক্যাল গিমিকের নিউজ কভার, নো আসানসোল রামনবমী টেনশন, নো ব্যাংক ফ্রড কেস, নো গরুর গোস্ত ইজ ইকুয়ালটু সাম্প্রদায়িক টেনশন। অনলি আরাম।

উপোর থেকে, জানোতো কে বলেই দিয়েছে, স্পন্সরও করেছে, এ আরাম কো হারাম নেহি হোনে দেঙ্গে।

মাঝে মাঝে বসুদা এই রকম ক্ষ্যাপামি করে। এই রকম অদ্ভুত বাক্যে কথা বলে। আমি, জো হুকুম মাই বাপ, বলে হাঁসতে হাঁসতে বের হয়ে যাই।

সেই বসুদা এখন আবার ফোন করেছে। আমি ইচ্ছে করে ফ্লাই ওভারের মাঝা মাঝি সব থেকে উঁচুতে বাইকটা দাঁড় করাই। কারণ এখান থেকে দূরে দ্বিতীয় হুগলী সেতুর মাথা দেখা যায়। মস্ত হেলানো লোহার পাইপ গুলোকে সরু কারেন্টের তার বলে মনে হয়। ডকের মাথায় উঁচু উঁচু ক্রেন, তার মাথায় টিমটিম আলো জ্বলে আর নেভে, চমৎকার লাগে দেখতে। চারি দিকে ডকের বড়ো বড়ো ক্যান, নিচে মাল গাড়ির ইয়াডে ওঠার জন্য অপেক্ষা করে আছে। দূরে ডকের বড়ো বড়ো জাহাজ বাঁধা আছে। এ সব দেখা যায়।

আমি হেলমেট খুলে ফোনটা কানে নিয়ে বলি, হ্যাঁ বসুদা বলো।

বসুদা ওপার থেকে হেসে বলছিল, কী আর বলব জামান। প্রেমের গল্পের কথা মাথায় আছে তো?

এই এক বসুদার স্বভাব। একবার যখন আমাকে দিয়ে এই প্রেমের গল্প লেখাবে বলে ভেবেছে, তো লেখাবেই। আর ঘন্টা অন্তর এই ভাবে ফোন করে জ্বালাতন করবে।

দেখছি বলেছি তো বাসুদা।

শুধু দেখলে হবে, খরচা করতে হবে যে জামান!

খরচা করব বসুদা। আমি দেবো। আর দেবে বলেছি যখন দেবো। জানোতো আমি কথা দিয়ে কথার খেলাপ করি না।

লাভ ইউ জামান। আমি এই কারণে তোমাকে এত ভালোবাসি। আমার সোনা মণি, আমার জিনে কা খনি। আমার...

এখান থেকে দূরে দ্বিতীয় হুগলী সেতুর মাথা দেখা যায়। মস্ত হেলানো লোহার পাইপ গুলোকে সরু কারেন্টের তার বলে মনে হয়। ডকের মাথায় উঁচু উঁচু ক্রেন, তার মাথায় টিমটিম আলো জ্বলে আর নেভে, চমৎকার লাগে দেখতে। চারি দিকে ডকের বড়ো বড়ো ক্যান, নিচে মাল গাড়ির ইয়াডে ওঠার জন্য অপেক্ষা করে আছে। দূরে ডকের বড়ো বড়ো জাহাজ বাঁধা আছে। এ সব দেখা যায়।

আমি বসুদাকে থামিয়ে, আবার শুরু করলে। রাখ এখন। আমি রাস্তায়, বলে ফোনটা কেটে বাইক স্টার্ট দিয়ে ফ্লাইওভারের উপরের বাতাস ফুঁড়ে চলতে শুরু করি। বেশ ফুরফুরে, ঠান্ডা বাতাস। দূষণ মুক্ত। কে বলবে কলকাতা এখন টেনশনে আছে।

রাতে, বাড়িতে, বৌকে নিয়ে বিয়ে বাড়ি থেকে ফিরতে ফিরতে প্রায় বারোটা বেজে গিয়েছিল। আমি ফ্রেশ হয়ে এক কাপ লিকার চা করে নিয়ে আমার পড়ার ঘরে ঢুকি। সু, আমার বৌকে বলি, আমাকে যেন ডেক না। তুমি শুয়ে পড়। লেখার কাজ আছে। ওটা করে শেষ শুতে যাব।

ও কোনো উত্তর দেয়নি। নিঃশব্দে শোবার ঘরের দিকে পা বাড়ায়। আমি ওর চোখে চোখ রেখে বুঝি, ও আমাকে ডাকছে, একা পাওয়ার আশায়। কিন্তু আমি ওর ডাককে উপেক্ষা করে পড়ার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিই। চেয়ারে বসে ব্যাগ থেকে ল্যাপটপটা বের করে অন করি।

হোমস্ক্রিনে নতুন গল্প বলে ফোল্ডার তৈরি করে ওয়ার্ডের পেজ খুলে চায়ে চুমুক দিই। মাথাটা পুরো শূন্য। কিছুই আসছে না। শুধু বসুদার কথা ছাড়া, একটা প্রেমের গল্প লিখতে হবে।

চেয়ারে পিঠ ছেড়ে দিয়ে আগাপাশতলা ভাবতে শুরু করতেই মাথায় একটা আইডিয়া আসে, ইউনিভার্সিটি লাইফের পুরাতন প্রেমের কথা লিখলে কেমন হয়? যেমন ভাবা, তেমনি কাজ শুরু। পিঠ টান টান করে অভ্রতে টাইপ করতে শুরু করি আমার প্রেমের গল্পের একটা আউট লাইন। আমি গল্প লেখার আগে মূল গল্পের একটা আউট লাইন মানে খসড়া তৈরি করে নিই, তারপরই মূল গল্প লিখি।

'মেয়ের নাম মনা, ছেলের নাম অয়ন। যাদবপুরে বাংলা পড়তে এসে ক্লাসনোট নেবার সূত্রে আলাপ। সেখান থেকে অনুরাগ ও প্রেম। কিন্তু প্রেম হল এবার পরিণতি? এই পরিণতি দু ভাবে হতে পারে। এক - আধুনিক ছেলে মেয়ে, সুতারং এদের প্রেম হবে আধুনিক। দুজন দুজনার শরীর চিনতে চাইবে? কিন্তু নিজস্ব স্পেস পাচ্ছে না। পার্কে গেলে পুলিশ। মেসে নিয়ে যেতে পারবে না। হোটেল ভাড়া করবে? টাকা নেই। বেকার দুজনে। এস এস সি হচ্ছে না। সি এস সিও নেই। রাস্তা ঘাটে হাত ধরে হাঁটলে মধ্যবিত্ত ভদ্র লোকের বাধা। টিটকারি। পুলিশি হেনস্তা। সে কারণে ঠিক করল প্রকাশে নগ্ন হয়ে দুজনে প্রেম করবে।

সিদ্ধান্ত দুই - ছেলেটা হিন্দু হবে, মেয়েটা মুসলিম। দুজনে একদিন পালিয়ে দিঘায় বেড়াতে যাবে। এখানে আবেগ ও যৌনতার একটু বর্ণনা থাকবে। মেয়েটা প্রেগন্যান্ট হবে। দুই পরিবার মানবে না। দুই পরিবারই মেনে নেওয়ার ভান করে বুঝিয়ে দুজনকে বাড়ি নিয়ে যাবে এবং খুন করবে।'

এই পর্যন্ত খসড়া করে এবার ভাবলাম বিষয়টাকে ডিটেলএ লিখি। লেখার আগে আর একবার পড়তে গিয়ে দেখি অত্যধিক মেলোড্রামাটিক হচ্ছে। ধুর...

একটা সিগারেট ধরাই। মাথাটা ধরেই আছে। ছাড়ছে না কিছুতে। ঘরে পায়চারি করি। আর সিগারেট টানি। যদি এর থেকে বেটার কিছু প্লট আসে। একজন লেখক সারা জীবন লিখে যায় শুধু মাত্র একটু বেটার প্লটের অপেক্ষায়। না, মাথা ব্ল্যাঙ্ক। হঠাৎ মনে পড়ল সেই পেপার কাটিং এর কথা।

ব্যাগ থেকে ওগুলো বের করি। লেখার টেবিলে এক একটা পড়ি আর ফেলে দিই। কোনোটাই মনোপুত হচ্ছে না। হচ্ছে না এই নয় যে খবরের কাগজের ওই খবরগুলো খারাপ! বরং এই সব খবর কাগজের বিক্রিকে ডবল করে দিতে পারে। প্রথম খবরটা ছিল, একজন কবির মৃত্যুর হুমকি নিয়ে শিরোনাম। দ্বিতীয়টা ছিল, মন্দিরে ও মসজিদে কে বা কারা যেন নিষিদ্ধ মাংস ফেলে গেছে। তৃতীয়টা ছিল, বোমা হামলায় কমপক্ষে চারশোর বেশি শিশু মারা গেছে। চতুর্থটা ছিল, হাজারো রোহিঙ্গা শরণার্থীকে দেখতে ইংল্যান্ডের রাণী আসছেন। পঞ্চমটা ছিল, সন্দেহ বাড়ছে একে অপরের প্রতি। সবাই সবাইকে পিটিয়ে মারছে।

ষষ্ঠটা সপ্তমটা অষ্টমটা ইত্যাদি ইত্যাদি। ধুর...চারিদিকে এই সব ঘটছে। অপিস, রাস্তাঘাট, এমনকী বিয়ে বাড়িতেও ছাড় নেই। সর্বত্রই একই আলোচনা। আজকে খেতে গিয়েই ওই একই কথা হচ্ছিল। আমার বন্ধু সফি, বড়ো সাইনটিস্ট, সেও বলছিল, যা চলছে এভাবে চললে, মধ্যযুগে ফিরে যেতে আর বেশি সময় লাগবে না। অংশু বলছিল, আসলে চাকরি নেই বাকরি নেই, কাজ নেই। ইয়াং ছেলেরা কী করবে। করার তো কিছু চাই। নেতারা এই গ্যাপটা ইচ্ছে করে তৈরি করেছে। করে ওদের কাজে লাগাচ্ছে। তা না হলে দেখ, রাম নবমীতে এত ধুন্ধুমার কাণ্ড। আচ্ছা শুনেছিস কখনো, কোথাও কোনো দেশে সরকার মাগনাতে টাকা বিলোয়। আমি হে হে করে বেরিয়ে এসেছিলাম ওই পার্টি থেকে। অথচ যার বিয়েতে গেছিলাম, সেই বিয়েটাও খুব ইন্টারেস্টিং। হিন্দু মেয়ের বাবা তার মুসলাম বন্ধুর ছেলের সঙ্গে ঘটা করে বিয়ে দিচ্ছে। আর সেখানে এই আলোচনা। আমি মানতে না পেরেই বেরিয়ে এসেছিলাম।

চেয়ার থেকে উঠে মনে হল সব ছুড়ে দিই। মনে মনে বসুদাকে গালিগালাজ করি। একী ফ্যাসাদে ফেল্‌লে বসুদা। রোববারের জনতাকে তৃপ্তি দিতে গিয়ে আমার ঘুমটাকে কেন হারাম করে দিলে!

টেবিল থেকে স্মার্ট ফোনটা বের করে স্ক্রিনের উপর যাদুকরের মতো হাত বুলিয়ে ফোনটাকে আনলক করে বসুদাকে ফোন লাগাই। না, ফোন সুইজ অফ বলছে। নেট্‌টা অন করে হটস্‌ অ্যাপে ম্যাসেজ দিই—বসুদা আই অ্যাম সরি। সঙ্গে একটা স্মাইলি ও কনফিউজড মুখ।

অনেক সময় নেটটা বন্ধ থাকায় একেবারে অনেকগুলো মেল, হটস্ অ্যাপে ম্যাসেজ ঢুকল। কোম্পানি, লোন, ক্রেডিট কার্ড, অফার, অন লাইন ছাড় ইত্যাদি। হটস্ অ্যাপে লিটিল ম্যাগাজিন ফ্রেন্ড গ্রুপে দেখি প্রায় আশিটার বেশি কনভারসেশন। কী এমন একটা বিষয় যা নিয়ে এত আলোচনা! মানুষের সময় কোথায় এত কথা বলার! ফলে মূল যে বিষয় নিয়ে এত আলোচনা, সেটা পড়তে আগ্রহী হই। পড়তেও শুরু করি-

'Md Zim Nawaz' লিখছেন - গতকাল আসানসোলে নূরানি মসজিদের ইমাম মৌলনা ইমদাদুল্লাহ্ রশিদীর পুত্রকে হত্যা করেছে দাঙ্গাকারী সংঘীরা। অত্যন্ত নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। বুকচিরে কলজে বের করে ইমাম সাহেবের পুত্রকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলা হয়েছে।

পোষ্ট মর্টমের পরে আসরের নামাজের আগে জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় অংশ গ্রহণ করেছিল দশ হাজারের বেশি মানুষ। পরিস্থিতি ছিল খুব ভয়ানক এবং উত্তপ্ত। আসানসোলের ২৫ নম্বর কাউন্সিলার নাসিম আনসারির বয়ান অনুযায়ী,

> "আল্লাহ্ আমার সন্তানের যতদিন আয়ু রেখেছিলান, ততদিন সে বেঁচেছে। আল্লাহ্-র ইচ্ছায় তার মৃত্যু হয়েছে। তাঁকে যারা হত্যা করেছে আল্লাহ্ তাদের কেয়ামতের ময়দানে শাস্তি দেবেন।
> কিন্তু, আমার সন্তানের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার অধিকার আপনাদের কারও নেই। আমার সন্তানের মৃত্যুর জন্য একটিও মানুষের উপর আক্রমণ করা চলবে না। একটিও মানুষকে হত্যা করা চলবে না। বাড়িঘর, দোকানপাট কোথাও ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ বা লুটপাট করা চলবে না।"

"জানাজার ময়দানকে শেষ কারবালার ময়দান বলে মনে হচ্ছিল। আবেগপ্রাণ যুবকদের চোখেমুখে ফুটে উঠেছিল প্রতিশোধগ্রহণের প্রতিজ্ঞা। আমি প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম। মনে মনে ভাবছিলাম, নাহ, আর আসানসোলকে রক্ষা করা গেল না।"

জানাজার নামাজ শুরুর আগে মৃত সন্তানের পিতা ইমাম ইমদাদুল্লাহ্ রশিদি খুদবা (বক্তব্য) দিতে উঠলেন। ইমাম সাহেবের উর্দু বক্তব্যের নির্যাসটুকু অনুলিখন করার চেষ্টা করলাম,

"আল্লাহ্ আমার সন্তানের যতদিন আয়ু রেখেছিলান, ততদিন সে বেঁচেছে। আল্লাহ্-র ইচ্ছায় তার মৃত্যু হয়েছে। তাঁকে যারা হত্যা করেছে আল্লাহ্ তাদের কেয়ামতের ময়দানে শাস্তি দেবেন।

কিন্তু, আমার সন্তানের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার অধিকার আপনাদের কারও নেই। আমার সন্তানের মৃত্যুর জন্য একটিও মানুষের উপর আক্রমণ করা চলবে না। একটিও মানুষকে হত্যা করা চলবে না। বাড়িঘর, দোকানপাট কোথাও ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ বা লুটপাট করা চলবে না।"

আমার হাতটা থর থর করে কাঁপছিল। এরপর কী হয়েছিল, শেষটাই বা কী হয়েছিল? - প্রচণ্ড কৌতূহলে দ্রুত দীর্ঘ ম্যাসেজটা স্ক্রল করে শেষের দিকটাতে এসে পড়তে শুরু করলাম,

"... শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব আপনাদের। আর যদি, আপনারা শান্তি বজায় রাখতে না পারেন, তাহলে ভাবব-আমি আপনাদের আপন নই। আমি আসানসোল ছেড়ে চিরতরে চলে যাব।"

সাথে সাথে পরিবেশ অদ্ভুত ভাবে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। জানাজার নামাজ শেষ হয়। প্রত্যেকেই নিজের নিজের বাড়ি ফিরে যান। মৌলানা সাহেব ফিরে যান মসজিদে।

না, আসানসোলের মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষকে শান্ত করার জন্য একজনও পুলিশ বা একজনও প্রশাসনিক লোকের দরকার পড়েনি। মৌলানা সাহেবের মোহিত করা বক্তব্যই পুরো পরিস্থিতিকে শান্ত করে দিয়েছে।'

এসি চলার কারণে ফ্যানটার স্প্রিড কমানো আছে, তাও এত শব্দ করছে কেন? কয়েক মিনিট থম মেরে বসে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিলাম। আসলে জনতাকে মোহিত করার মতো কিছু দিতে হবে। এই মোহিত করার অস্ত্র যে যেমন ভাবে কাজে লাগায়, সে বা তারা তেমন ফল পায়। মৌলনা সাহেব এক ভাবে কাজে লাগিয়েছে। বসুদা উপর মহল থেকে স্পন্সর পেয়ে এক ভাবে। বাকিরা বাকিদের মতো করে। আমি মৌলনা সাহেবকে হ্যাটস্ অফ করে বসুদাকে টেক্স করলাম, আগেরটা ডিলিট করে দিয়ে। আমি পারব বসুদা একটি প্রেমের গল্প লিখতে। পারব প্রেমের আবেশ দিয়ে ভুলিয়ে রাখতে রোববারের মৌতাতে বসা সমস্ত জনগণকে। যারা পারিপার্শ্বিকতার সব কিছু ভুলে থাকতে চায়, ভুলে যেতে চায় এবং ভুলিয়ে রাখতে চায় - তাদের জন্য একটা প্রেমের গল্প লিখতেই হবে আমাকে।

চেয়ারে পিঠ টান টান করে বসে, কি বোর্ডের উপর হাত রেখে স্ক্রিনে চোখ রাখি। আগের খসড়া সহ গোটা ফাইলটা ডিলিট করে দিই। আবার নতুন করে ওয়ার্ডে ফাইল করি। নাম দিই, একটি প্রেমের গল্প লেখার জন্য অনুরোধ।

ওয়ার্ডে গল্পের খসড়া করতে টাইপ শুরু করি —

রশিদ মিঞা। গ্রাম রূপকথাপুর। মমতাজ বেগম, তাঁর স্ত্রী, উপকথাপুর তাঁর বাপের বাড়ি। তাদের একটি মাত্র ছেলে। নাম সভ্য। উপকথাপুরে অসীম ও মেঘণা থাকে। তাঁর একটি মেয়ে আছে নাম নুরি। সভ্য মামার বাড়ি গিয়ে নুরির প্রেমে পড়বে। প্রেমের প্রস্তাব দেবে সভ্য। গ্রহণ করবে নুরি। প্রকাশ্যে প্রেমও করবে। কেউ বাধা দেবার থাকে না যে ওখানে। সেখানে পুকুরের জল সব নীল। নদীর জল গেরুয়া। মানুষের ধর্ম নেই, তবে গোত্র আছে। গোত্র সব ফুলের নামে। গোলাপ গোত্র, রজনী গোত্র, টগর গোত্র, হাসনুহেনা গোত্র —এই রকম। এই গোত্রকে যে চালাতো সে সবার সমর্থনে জিতে আসত। যদি কেউ একজনও বিপক্ষে যেত তবে সে চালকের আসনে বসত না। এই গোত্রপিতা সবাইকে পালা করে একবার করে হতে হবে। গোত্রপিতা ও সবাই এক সঙ্গে ঘাসের উপর সবে ভালোবাসা খাবে। এটাই একমাত্র খাবার। আর বেঁচে থাকার জন্য শান্তির নিঃশ্বাস নেবে।

একদিন অন্য কোথা থেকে একজন আসবে। সে গোলাপগোত্রের রাম ও টগর গোত্রের রহিমের মধ্যে হিংসার খাবার ঢুকিয়ে দেবে। রাম রূপকথাপুরের লোক। রহিম উপকথাপুরের লোক। এই প্রথম গোত্রপিতা নির্বাচনে রাম ও রহিম বিরোধিতা করবে। এবার গোত্রপিতা হবার ভার পড়েছিল রশিদ মিয়াঁর উপর। রশিদ মিয়াঁ দুজনের উপর দুই পাড়ার ভার দেবে। রাম ও রহিম দুজনেই রূপকথাপুর এবং উপকথাপুরকে নিয়ন্ত্রণ করবে কঠোর ভাবে। নানা নিয়মের অনুশাসন সবার জন্য নির্দিষ্ট করে দেবে। কেউ কারো সঙ্গে দেখা করতে পারবে না। ক্রমশ সবার মধ্যে একে অপরের প্রতি সন্দেহ জন্মাবে। সন্দেহ থেকে ভয় আর ভয় থেকে ঘৃণার জন্ম হবে।

এই পরিস্থিতিতে সভ্য ও নুরি লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা করবে। একদিন ধরা পড়বে। তারপর...

আমি প্রায় ঝড়ের গতিতে এই পর্যন্ত টাইপ করে থেমেছি। একবার খসড়াটা পড়ি। পড়ে মনে হয় খসড়াটা ঠিকঠাক হয়নি। এর মধ্যে আরো কিছু যোগ বিয়োগ হবে। না হলে আমি ঠিক প্রেমের ও বাস্তবের অবস্থানকে স্পষ্ট করতে পারব না।

আমি আবার কম্পিউটারের কারশেডারটা ফাইলের প্রথমে নিয়ে যাই। একটা সিগারেট ধরিয়ে মেরুদণ্ডকে চিয়ারে ছেড়ে দিই। সিগারেট খেয়ে আবার মেরুদণ্ড সোজা করে বসতে হবে।

(পুনর্মুদ্রণ)

বিকাশকান্তি মিদ্যা

শৈশবের পাঁচালি

।। বেতের লতার নিচে চড়ুয়ের ডিম যেন নীল হ'য়ে আছে ।।

সাত ভাই বোনের মধ্যে ছোট বলে পাড়াতুতো দিদিমা-ঠাকুমারা আমাকে দিয়েছিল তা-কুড়ানো তকমা। মুরগীর তা-খোলাতে সব শেষে যে বাচ্চাটা ডিম ফুটে বের হত, সে সাধারণত একটু ছোট ও দুর্বল প্রকৃতির হত। তা-খোলার এই শেষ বাচ্চাটাই তা-কুড়ানো। মানুষের ক্ষেত্রেও তাই, চেহারাতেই ছিল তার প্রমাণ।

গ্রামে বাড়িতে বাড়িতে হাঁস-মুরগী পোষার চল। সখের পোষা নয়, জীবিকার দায়। আমরাও তার বাইরে ছিলাম না। প্রতিদিন হাঁস-মুরগী মিলিয়ে পাঁচ-ছ'টা ডিম হলে গরীবের সংসারে তেলটা, ডালটা, লঙ্কাটা মেলে।

রোজ সকালে আসতো ডিম ব্যাপারী। মাথায় গামছার পাগড়ির উপর অদ্ভুত ভারসাম্যে ডিমের ঝুড়ি। ঝুড়ির উপরে জালের ঢাকনা। ডিম যাতে পড়ে না যায়। সকাল সাতটা থেকে শুরু হতো ব্যাপারীদের আনাগোনা। চার পাঁচ জন ব্যাপারী মোটামুটি রোজ-ই আসতো। একটা ডিম দু'আনা। পয়সার হিসেবে বারো পয়সা। এক পয়সা, দু'পয়সা, পাঁচ পয়সা, দশ পয়সা, চার আনা বা পঁচিশ, আট আনা বা পঞ্চাশ আর ষোলো আনা বা এক টাকা তখন মুদ্রায় প্রচলিত।

ডিমের সঙ্গে ব্যাপারীরা কিনতো হাঁসের পালক। কেবল মাত্র সাদা পালক। সাদা পালক কুড়ানোটা তখন শৈশবে নেশার মতো, আসতে যেতে নজর সব সময় পুকুর পাড়ে হাঁসের আড্ডায়। হাঁস বা মুরগী, তখন দেশি প্রজাতিরই চল।

সেই হাঁস আর মুরগীর ডিম পাড়ার সময়টা আলাদা। স্থানও। হাঁস ডিম পাড়ে রাতে, রাতের থাকার ঘরে। মুরগী দিনে। দিনে তাকে যেখানে আটকে রাখা হয় তার মধ্যে।

তবে হাঁস হোক বা মুরগী হোক সবাই নিয়ম মানে না। গোয়ালের গরু যেমন এক আধটা দুষ্ট প্রকৃতির হয়, গোঠ থেকে ছাড়া পেলেই দৌড় লাগায়, অন্যের গাছ-পালা বা বাগান খেতে; হাঁস-মুরগীর দু'একটা তেমন।

আমাদের একটা লাল মুরগী ছিল, ঘরে কোনোদিন ডিম দিতে দেখিনি তাকে। এটাই আবার আমার বা আমার উপরের দাদার কাছে ছিল খবু লাভজনক বিষয়। রোমহর্ষকও কম না।

সকাল ন'টা ছিল লাল মুরগীর ডিম দেওয়ার সময়। তার আগে আগে তাদের জন্যে জাল বাঁশ দিয়ে বানানো ঘেরাটোপে মা তাদের খেতে দিত। খাওয়ার পর অন্য মুরগীগুলো ওই ঘেরাটোপে ডিম দিলেও লালি ঠিক কোনো না কোনো ভাবে ঘেরাটোপ থেকে বেরোবেই বেরবে, পাড়া বেড়ানো বউদের মত। তারপর শুরু হত তার জায়গা খোঁজার পালা। কোনো দিন গোয়ালে গরুর জাবনা দেওয়ার নাদা, তো পরদিন খড়ের গাদা বা তুষ-ঘুঁটের মাচা হল লাল মুরগীর ডিম দেওয়ার পছন্দের ঘাঁটি।

সংসারের কাজের ফাঁকে মা বা দিদিমার এত খোঁজ রাখার সময় বা কোথায়? তবে আমার বা দাদার কাছে তথ্যটা আবিষ্কৃত হতে সময় লাগেনি বেশিদিন। তাই নাদা হোক বা খড়ের গাদা বা মাচা থেকে ডিম কুড়িয়ে সকালে ব্যাপারীর কাছে লুকিয়ে বিক্রি করে দু'আনা পয়সায় যেন লক্ষ টাকার সুখ!

তবে সে সুখের গুড়ে লালিই প্রায় বালির ব্যবস্থা করত। বা বাড়া ভাতে ছাই।

লালি বলে কথা নয়, মুরগী মাত্রেই ডিম দেওয়ার পর, ত্যাগের আনন্দে নাকি, গলাতে বেশ আদুরে একটানা 'কঁক কঁক' একটা ধ্বনি করে পাড়া জাহির করে। সেটাই হলো কাল। পকেটে তখন দু'চার আনা জমেছে কী জমেনি, লালির 'আনন্দধ্বনি'তে মা-ই বুঝে ফেলল সব, তাই বলি, মুরগী সাতটা, ডিমও হওয়ার কথা সাতটা, পাই কেন ছ'টা। এসব এই লালি হতচ্ছাড়ির কাজ? খেয়াল রাখিস তো খোকা।

পাহারাদার নিযুক্ত হয়ে লাভের ব্যবসা গেল মাটি হয়ে। লুকানো তখন দায়!

তবে লালি-ই একবার ঠকিয়ে দিল বেদম। শীতকাল, ঘর পালানো স্বভাব, যাবে কোথায়? অন্য সব ঘাঁটি যেহেতু জানা হয়ে গেছে আমাদের, এবার ওর চোখে ধুলো দেওয়ার পালা।

শীতকালে খড় খবু গরমের কাজ করে। সেই মোতাবেক প্রতি বছর বুড়ো দিদিমা খড়ের বিচালি বিছিয়ে বিছানা পাতে, চারপাশে বিচালি দিয়ে ঘেরা সে বিছানা ছিল আমার খুব স্বপ্নের একটা জায়গা। লুকোচুরি খেলা থেকে রান্নাবাটি খেলায় জায়গাটা যেন আদর্শ। এমন দারুণ জায়গা যে লালির এত পছন্দ জানবো কী করে!

সেবার এক মাসের উপর হয়ে গেল, আমি বা দাদা লালির ডিম পাড়ার রহস্য কিছুতেই আর পারি না উদ্ধার করতে। গোয়ালের নাদা থেকে খড়ের গাদা, তুষের মাচা থেকে ছাইয়ের স্তূপ, সব খোঁজা হয়ে গেছে। ডিমের কোনো হদিশ নেই, অথচ ডাকেও কোনো ক্ষান্তি নেই। তাহলে কি মিথ্যা ডাকে ভোলায় নাকি আমাদের? অগত্যা আশপাশ সম্ভাব্য সব ঘাঁটি তন্নতন্ন করে খুঁজেও ডিমের কোনো চিহ্ন না পেয়ে অনুসন্ধান ছেড়েই

দিয়েছি যখন, হঠাৎ একদিন দিদিমার বিছানার পায়ের দিকে খড়ের দুটো বিচালি সরিয়ে দেখি লালি সেখানে বসে। আর যায় কোথায়? বিচালি সরাতে আলিবাবার গুপ্তধন! কী ভাগ্য, দাদা কাছে নেই! ইয়া আল্লা, এই সব ডিম আমার ভাগে? না জানি কত আনা হবে!

সেই আনন্দে গুনে দেখি পঁয়ত্রিশটা ডিম। এত ডিম একার পক্ষে আত্মসাৎ করা কঠিন বুঝে গুপ্তধন হাতছাড়া করে মা কে ডাকলে, মা-ও যে লালির কাছে এমন ঠকে যাবে, কী করে বুঝবো?

একটানা পঁয়ত্রিশ দিন ধরে ডিম দিলে শুরুর দিককার ডিম নষ্ট হওয়াটা স্বাভাবিক।

কিন্তু তাই বলে সতেরটা???!!!

গুপ্তধন হাতছাড়া হওয়ায় ব্যক্তিগত কষ্ট হয়েছিল ঠিক-ই, কিন্তু জরুরি অবস্থায় কডনিং-এর বাজারে সংসার চালাতে সতেরটা ডিম নষ্ট হওয়ার যন্ত্রণা অনেকদিন ভুলতে পারিনি, বিশেষ করে মায়ের কান্না ভেজা মুখটা মনে পড়লে।

মনে হতে পারে কথায় কথায় এই গরীবীয়ানার প্রসঙ্গ টেনে আনা, একি বিজ্ঞাপন নাকি?

না,দারিদ্র্যের এলিজি শোনানো লক্ষ্য নয়, তবু রাষ্ট্রিক কারণে হোক বা প্রাকৃতিক কারণে, গ্রাম বাঙলায় ওটাই যে নিত্য সঙ্গী। ওকে বাদ দিলে ইতিহাসকে মিথ্যা করা হয়। বাস্তবকে করা হয় অস্বীকার। হতে পারে সাধারণ একটা গ্রাম, তবু দিল্লীর দরবার বা বাংলার মসনদের ঢেউ গ্রামকেও ছাড়ে না। সে কথা অন্য প্রসঙ্গে।

ঘরের মুরগীর ডিম পাওয়ার মধ্যে আনন্দ ছিল,কিন্তু ভয়ও ছিল যথেষ্ট; ধরা পড়ার ভয়। মা যদি দেখে ফেলে, কিংবা দিদিমা বা বাড়ির অন্য কেউ। তাহলে পুরো চুরির দায়। সে ভাবে ধরা না পড়লেও, পাওয়া ডিম প্যান্টের পকেটে লুকিয়ে বিক্রি করতে গিয়ে, পকেটেই ফেটে গেছে কত বার, লাভের গুড় পকেটেই খেয়েছে, তার হিসেব আর রাখা হয়নি।

তবে লাল মুরগীর ডিম পাওয়ায় আনন্দ তো ছিল-ই, পাড়াতুতো হাঁসের ডিম খুঁজে পাওয়ার আনন্দ অবাধ, অঢেল।

পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে আমার কেমন যেন আড়ির একটা সম্পর্ক। আড়ি ঠিক না, ভীড় এড়িয়ে চলাই তা-কুড়ানো দুবলার স্বভাব। নির্জনতাই প্রিয়। তাই গায়ের জোর খাটানোর খেলার ত্রিসীমানায় আমার টিকি খুঁজে পাওয়া দায়। সবাই যখন মার্বেল বা ডাং-গুলিতে ব্যস্ত, হা ডু ডু বা দাড়িয়াবান্ধায় সবাই যখন নিবেদিত প্রাণ,'আম আঁটির ভেঁপু' হাতে অপু এসে ডেকে নিয়ে যেত আমায়। হাতে কঞ্চির একটা ধনুক। পিঠে প্যান্টের দড়িতে গোঁজা পাটকাঠির তীর। অশ্বত্থ পাতার মুকুট মাথায়। আম, জাম, খেজুর গাছের তলায় তলায় ঘুরি, কলাগাছের ঝোপে, বাঁশবনের নির্জনতায়। আমি তখন তো আমি না, মহাভারতের অর্জুন। গাছপালা সব কৌরবপক্ষ। পাটকাঠির তীরের

মাথায় খেজুরকাঁটার ফলা। তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেও বা কী, কিংবা কোনবার যদি লেগেও থাকে তীর, তাতে আম-জামের কী-ই বা এসে যায়। তারা যেমন ছিল তেমন-ই থাকে। তাতে অবশ্য অর্জুনের বীরত্বের কোনো ঘাটতি ঘটে না। সবটাই যেহেতু কল্পনা। দাঁড়িয়ে থাকা আম-জাম কৌরবকুল—দুর্যোধন-দুঃশাসন। তা-কুড়ানো অর্জুনের কল্পনায় তাদের বাঁচা-মরা। তবে কাল্পনিক এই কুরুক্ষেত্রে নিরীহ কলাগাছগুলো বেচারী সাধারণ সৈনিক। তাদের জলজ নরম শরীরে পাটকাঠির তীর সহজেই বিদ্ধ হয়ে যখন জল ঝরাতো, পাণ্ডবের জয় তখন আটকায় কে? ধর্মযুদ্ধ বলে কথা!

এই ভাবে যুদ্ধ জয় করতে করতে, কখনো বা প্রজাপতি বা জলফড়িং-এর পিছন ধাওয়া করতে করতে, খিড়কি পুকুর, কুঁড়ের পুকুর, বামুন পুকুরের পাড়ে যেতাম চলে কখনো। সেখানে হল-কলমির ঝোপ, মুথা ঘাসের দাম, কলাগাছের বাগান, ভাঁটফুলের বন আষ্টেপিষ্টে বেঁধে ফেলতো। নাগরিক উপকরণশূন্য আমাদের সেই শৈশবে খেলার উপকরণের অভাব ছিল না; ভাঁটফুলের পুংকেশর ছিল তেমনই একটা বস্তু।

বসন্তের মুখে মুখে পুকুরের পাড়গুলোতে ভাঁটফুলের যেন বান ডাকতো। বুনো একটা গন্ধে ভরে যেত চারপাশ। এই ভাঁটফুলের কেশর ছিঁড়ে জলে ফেললে অদ্ভুত দক্ষতায় কেশরটা জলের উপর বন বন করে ঘুরতো। বেশ কিছুক্ষণ। মরসুমি এই ফুল ছিল খেলার সাথী। ভাঁটফুলের ডাল ভাঙতেও চলে যেতাম কোনো কোনো দিন। আর গোপন সে অভিযানে, নির্জন দুঃসাহসিকতায় সঙ্গ দিত প্রজাপতি, জলফড়িং-এর সাথে সাথে পাড়াতুতো কাকি-জেঠিমার ঘর-পালানো-হাঁসের ডিম। হল-কলমির ঝোপে বা মুথাঘাসের দামে পরিপাটি করে রচে নেওয়া বাসায় ধবধবে সাদা একটা বস্তু। প্রথম ঝলকে বিশ্বাস করা দায়! মহাভারতের অর্জুন মুহূর্তে তা-কুড়ানো ছা হয়ে সে কী আনন্দ, সে কী বিস্ময়! যেন ‘একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি আহিরীটোলায়,/একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি বাদুড়বাগানে,/একটি পয়সা যদি পাওয়া যায় আরো—’

জীবনানন্দ তখন অনুসৃত হচ্ছে বি.এ. পড়া সেজদার কলেজের খাতায়। তার কাছে ভারবির শ্রেষ্ঠ কবিতার বইয়ে নিরীহ গরুচোরের মতো একটা মুখ। ঠোঁটদুটো চেপে মুখটা ফোলানো। তখন অত কি আর জানতাম নাকি এমন করে কত শৈশব চুরি হয়ে যায় ‘পথের পাঁচালী’ বা জীবনানন্দের কবিতার পাতায় পাতায়, এমনই সব ছেনেছুনে চিরন্তন শৈশব, শৈশবের অনুভূতি বন্দী করে দেন কালির আখরে?

ডিম কুড়ানোর পালা সাঙ্গ করা যায় সেজদার হাত ধরে, কিংবা যে পালা সাঙ্গ হওয়ার নয়।

আমাদের পাড়ার উত্তর দিকটা ছিল ফাঁকা চাষের মাঠ। উত্তরের বাদা বলে পরিচিত। বাদায় চাষ বলতে বছরে একবার, আমন ধান। শীতকালে সেই আমন ধান কাটা হয়ে গেলে মাঠে পড়ে থাকতো শুকনো খড়, নাড়া। ‘ধান কাটা হয়ে গেছে কবে যেন—ক্ষেতে মাঠে পড়ে আছে খড়/ পাতা কুটো ভাঙা ডিম—সাপের খোলস নীড় শীত।’ জীবনানন্দের

'রূপসী বাংলা'র চিরন্তন সেই মাঠের টুকরো বুঝি পড়েছিল আমাদের মাঠে। আর ছিল মাঠভরা সেজদার পাগলামি। কী বর্ষা, কী গরম, হেমন্ত, বসন্ত-ই বা কী, মাঠের, মাটির, প্রকৃতির নাড়ির খবর জানতে গেলে জীবনানন্দ বলতে পারেন, আর পারেন সেজদা।

কোন গাছে বাবুই বাসা বেঁধেছে, ভাগাড় থেকে কাদের তাল গাছে শকুন এসে বসল, এই গরমে চাতক এসে কাদের পুকুর থেকে জল খায়, কাক কোথায় কোকিলের বাচ্চাকে মানুষ করছে—সব খবর সেজদার 'বঙ্গলিপি' নোটবুকে লেখা। কেবল-ই কি পাখি? ফুলের খবর, মাছের খবর, গরু-বাছুর, আকাশ-বাতাসের সব খবর সেজদার কাছে, তার খাতায় যথাসাধ্য দিনলিপি হয়ে বসে আছে। সন্ধ্যা তারা কখন ওঠে, ভোরে কখন অস্ত যায়, কোনটা সপ্তর্ষি মন্ডল, কালপুরুষ কোনটা বা; ধ্রুবতারা কী ভাবে গভীর সমুদ্রে দিক-হারা নাবিকের দারুচিনি দ্বীপ হয়ে ওঠে, সবই সেজদার নখ-দর্পণে। চাঁদের রামধনু থেকে আলেয়ার আলো।

সেই সেজদা গ্রীষ্মের মাঝামাঝি এসে খবর দিত মাঠ চড়ুইয়ের বাসা কার জমিতে এবার হয়েছে, ক'টা করে ডিম পেড়েছে তারা। তথ্যটুকু কেবল খবর হিসেবে পরিবেশিত হয়েই ক্ষান্ত হত না। আমার মন খারাপের ওষুধ হিসেবে কাজ করত।

হয়ত কোন বায়না পূরণ না হওয়ার জন্যে মনটা খুব খারাপ, হয়ত বা বকুনি খেয়ে সকাল থেকে ভালো লাগছে না কিছু, হঠাৎ উদয় সেজদা। বলা নেই, কওয়া নেই কোলে তুলে লাগিয়ে দিত হাঁটা। শর্ত একটাই, চোখ রাখতে হবে বন্ধ। যতক্ষণ হাঁটা চলবে চোখ খোলা চলবে না। মন খারাপ, মাঠ ভরা রোদ্দুর, কোলে উঠে চলার একটা দুলুনিতে বন্ধ চোখ কখন আসত জুড়ে।

তারপর একটা সময় মাঠের মাঝখানে গিয়ে, সেজদা যখন চোখ খোলার আদেশ দিত, ঘুম চোখ রগড়ে, বিস্ময়ের তল মেলা দায়! 'বেতের লতার নীচে চড়ুয়ের ডিম যেন নীল হয়ে আছে '। অনেক পরে জীবনানন্দ জানিয়েছেন আমাকে। তবে আমাদের উত্তর বাদায় বেত আর কোথায় পাওয়া যাবে, ছোট্ট এক গোছা নাড়ার গোড়ায় পাকানো একটা বাসা, তার মাঝে নীলাভ পটে কালোর ছিটে দেওয়া এক জোড়া ডিম!! ডিম তো না, খোলস মোড়া স্বপ্নের দু'টো টুকরো!!!

তারপর সেই থেকে সেজদার সঙ্গে পায়ে পথে প্রতিদিন। খোলস মোড়া স্বপ্ন দুটো ডানা মেলবে কবে!?

এখনও প্রতিবছর সর্ষের মধ্যে সূঁচ খুঁজে পাওয়ার মতো বিশাল ওই মাঠে চড়ুইয়ের বাসা কোথায়, তাতে দুটো নীলাভ খোলস মোড়া প্রাণ-ই বা কোথায়, ঠিক খুঁজে পায় সেজদা। বাদাটাই যেন তার ঘরবাড়ি।

সে যেন আর এক পথের পাঁচালি।

আপাতত শৈশবে ফেরা যাক।

(ক্রমশ)

আব্দুল বারী

শাদীর সাতকাহন পর্বের উপপর্ব

বাংলার লোকসংস্কৃতির একটি অন্যতম ধারা হলো মুসলিম বিবাহ গীত। মুসলিম সমাজে এই বিবাহ গীত কবে কিভাবে সৃষ্টি হল তা নিয়ে গবেষণার অবকাশ আছে। মধ্যযুগে মুসলিম শাসকেরা ভারত তথা বাংলায় আসেন। এরা এসেছিলেন ইরাক ইরান তুরস্ক আফগানিস্তান ও আরো নানা জায়গা থেকে। আর এই মধ্য এশিয়া সুপ্রাচীন কাল থেকে সংগীতের পীঠস্থান। নানা উৎসবে, আচার অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশিত হতো সেখানে। আইয়ামে জাহেলিয়াতের সময়ে থেকে ইসলাম পরবর্তী সময়েও সংগীতের এই ধারা সেখানে বহমান ছিল। মধ্য এশিয়ার এই মানুষগুলো যখন বাংলায় আসেন তারা সেই সংগীত নিয়ে আসেন। বাংলাতেও বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানে বা এমনি আনন্দ উপভোগ করার জন্য তারা সংগীত শ্রবণ করতেন। বিবাহের মতো আনন্দ উৎসবে সংগীতের এই ধারাটি কখন যেন নিঃশব্দে ঢুকে পড়ে।

ইসলামে বাদ্যসহ সংগীত বর্জনীয়। শরীয়তপন্থীরা কঠোর ভাবে এই নিষেধ অনুসরণ করেন। তবু তারই মধ্যে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বহুদিন যাবৎ বাদ্যযন্ত্রসহ বিবাহ গীত প্রচলিত রয়েছে। তবে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে কবে কিভাবে এই ধারা এসেছিল তা বোঝা শক্ত। সপ্তদশ পরবর্তী সময়ের মুসলিম বিবাহ গীতে মঙ্গলকাব্য ও পদাবলী সাহিত্যের প্রভাব লক্ষ করা যায়। বিবাহের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য বর-কনের মঙ্গল কামনায় এই গীত রচিত হয়। কথায় ও সুরে মঙ্গলকাব্যের কিছু কিছু প্রভাবও অঞ্চলভেদে লক্ষ্য করা যায়। আবার পদাবলীর কানাই, কেলেসোনাও স্থানে স্থানে গভীরভাবে স্থান করে নেয়।

এ কথা ঠিক, বিবাহের এই গীত একান্তভাবে নিরক্ষর মুসলিম মহিলাদের সৃষ্টি। তাদের দেখা ও শোনার জগত থেকে কথা উপমা সংগ্রহ করে নিয়ে এই গীত তারা বাঁধতো। তাই হিন্দু-মুসলমান যে অঞ্চলে নিবিড় ভাবে বসবাস করে সেখানে এই গীতির প্রভাব গভীর। দীর্ঘদিন পাশাপাশি বসবাস করার ফলে বা পাশের পাড়ায় অনুষ্ঠিত

পাঁচালী, কীর্তন গানে দেবদেবীর নাম বারবার শুনে তার দ্বারা প্রভাবিত হত মুসলমান সমাজের মেয়েরা। ফলে অনেক সময় তাদের সুরে ও কথায় মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলীর ঢং চলে আসতো। যেমন—

১. আমার আঁশি তলাতে বাঁশি বাজেরে কালা কানাই।

২. আসি আসি বলে আশিক কার প্রেমে মজেছিলে
তোমার আমার হয় গো দেখা ওই কদমের তলে।

এই গীতে স্পষ্টতই বৈষ্ণবীয় সুর ধ্বনিত হচ্ছে। কানাই কোন মুসলিম চরিত্র নয়। প্রেমিক পুরুষ, হিন্দু দেবতা। কি অবলীলায় নিরক্ষর মুসলিম মহিলারা তাদের গীতে তাঁকে স্থান দিয়েছে এবং বাদ্যসহ তা পরিবেশিত হত মুসলিম বিবাহ অনুষ্ঠানে। এরকম আরো অসংখ্য গীতে বৃন্দাবন, যমুনা, কলস নিয়ে জল আনতে যাওয়া ইত্যাদি প্রসঙ্গ আছে। তবে এইসব গীতগুলি কত প্রাচীন বা কোন সময় বাঁধা হয়েছে তার সময় নির্ধারণ করা খুবই কঠিন। উক্ত গীত দু'টি গত শতাব্দীর প্রথম থেকেই প্রচলিত ছিল একথা জোর দিয়ে বলতে পারি। তবে তারও কত আগে থেকে এই গীত চলে আসছে তা বলা কঠিন।

বিয়ের দুই-তিনদিন আগে থেকেই বাড়ি আত্মীয়-স্বজন এ ভরে যেত। বাড়ি গমগম করত মানুষজনে। বিয়েতে তখন কত রকম রীতি রেওয়াজ চালু ছিল। গায়ে হলুদ, টিঁকি মুলানি, ক্ষীর খাওয়ানি এমনতর আরো নানান বিষয় ছিল। এইসব অনুষ্ঠানে বাড়ির মহিলারা গীত গাইত। গ্রামীণ মহিলাদের দ্বারা বাঁধা এই বিবাহের গীত বিবাহ অনুষ্ঠানে আলাদা মাত্রা যোগ করত। ঢোল বাজিয়ে গীত গাওয়ার রেওয়াজ ছিল। ঢোল বাজিয়ে মহিলাদের গীত গাইতে না দিলে তাদের মন খারাপ হতো। বাড়িতে অশান্তি বেঁধে যেত। তবে সব মুসলিম পরিবারে এই বিবাহ গীত হতো না। অনেক কঠোর মুসলিম পরিবারে বিবাহ গীত একেবারে নিষিদ্ধ ছিল।

এইসব আচার একান্ত ভাবে মহিলাদের নিজস্ব ব্যাপার। পুরুষরা এখানে গৌণ। তাদের ভূমিকা ছিল না বললেই হয়। অঞ্চলভেদে আচার ছিল আলাদা আলাদা। আমাদের এলাকায় দেখেছি বিয়ের তিনদিন আগে থেকে বর-কনেকে হলুদ মাখানো হতো। তার আগে টিঁকি মুলানি অনুষ্ঠান। টিঁকিশাল ভালো করে ঝাড়পোছ ও গোবর জলে লেপাপোছা করা হতো। পাঁচ সাত জন মহিলা গিয়ে ঢেঁকির গড়ে কিছু আতপ চাল দিয়ে ঢেঁকিতে আড়াই ঘা পাড় দিত। তার আগে ঢেঁকির মাথায় সরিষার তেল দিয়ে তিনটে দাগ কাটতো। আঙুলে করে তেল নিয়ে টিঁকির মাথায় তিনটি তেলের দাগ আর তার মাঝে মাঝে আলতা সিঁদুর বা কুমকুমের দাগ কাটতো। মুসলমান পরিবারেও টিঁকি মুলানির সময় সিঁদুর বা কুমকুমের ব্যবহার ছিল। নতুন শাড়ি দিয়ে টিঁকি ঢেকে রাখা হতো। তারপর সেই শাড়ি চার জন মহিলা চারকোনা ধরে তুলে ধরতো। যারা ঢেঁকিতে পাড়

দিচ্ছে তাদের মাথার উপর দিয়ে ধরে যে সামনে বসে গড়ে রাখা আতপ চাল বা অন্যকিছু নেড়ে দিচ্ছে তার মাথার উপর পর্যন্ত চাঁদোয়ার মত তুলে ধরতো। আড়াই ঘা পাড় দিয়ে দুজন মহিলা ঢিঁকি থেকে নেমে আসতো। তারপর মাথার উপরের কাপড় গুটিয়ে নেওয়া হতো। এখানে পাড় দেওয়ার সময় গীত গাওয়া চলত। যারা সেখানে উপস্থিত থাকত তাদের হাতে বাতাসা বা ওই জাতীয় খাবার দেওয়া হতো। অনেকে সেখানে দাঁড়িয়ে খেত। কেউ আঁচলে বেঁধে নিয়ে বাড়ি যেত। নাতি-নাতনিদের দিত। ঢেঁকির মাথায় যে তেল দেওয়া হতো সেই তেল পাত্র থেকে তেল নিয়ে সবাই একটু একটু করে মাথায় দিত। তাদের সঙ্গে আসা বাচ্চাদের মাথায়ও দিয়ে দিত। তাদের হাতেও বাতাসা বা কোন খাবার জিনিস দেওয়া হতো। মহানন্দে বাচ্চারা খেত।

আজকাল বিবাহে ঢিঁকি মুলানি অনুষ্ঠান নাই। আসলে গ্রামে এখন ঢিঁকি তো নাই বললেই চলে। আর বিবাহের প্রচুর আচার কালের তালে তালে মিলিয়ে গেছে। সেই সব পুরনো মানুষের বিচিত্র ভাবনা কালের গর্ভে এখন বিলীন। ঢিঁকি মুলানি তেমনি এক আচার যা কালের স্রোতে বয়ে গেছে।

এমনই আরো দুটি বিবাহ আচার ছিল তেলচাবড়ানি ও গায়ে হলুদ। গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান এখনো আছে তবে তা অন্যভাবে বয়ে চলেছে। আগের মত জাঁকজমক নাই। তেলচাবড়ানি আচার গ্রামে ঘরে এখন বিরল। আগের দিনে দেখেছি গায়ে হলুদের আগে বর-কনেকে উঠোনে বা বড় কোনো ঘরের মাঝেতে বসানো হতো। যেখানে বসানো হতো সেই জায়গাটা গোবর জল বা রাঙ্গামাটি দিয়ে সুন্দর করে লাতা দিত। সেটা শুকিয়ে গেলে তার উপর ছোট বিছানা বা কাঠের বড়

আরো দুটি বিবাহ আচার ছিল তেলচাবড়ানি ও গায়ে হলুদ। গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান এখনো আছে তবে তা অন্যভাবে বয়ে চলেছে। আগের মত জাঁকজমক নাই। তেলচাবড়ানি আচার গ্রামে ঘরে এখন বিরল। আগের দিনে দেখেছি গায়ে হলুদের আগে বর-কনেকে উঠোনে বা বড় কোনো ঘরের মাঝেতে বসানো হতো। যেখানে বসানো হতো সেই জায়গাটা গোবর জল বা রাঙ্গামাটি দিয়ে সুন্দর করে লাতা দিত।

পিড়ি পেতে বর বা কনেকে বসাত। কাঁসার এক পোয়া গ্লাসের এক গ্লাস সরিষার তেল নিয়ে তার খানিকটা বর বা কনের মাথায় ঢেলে দেয়া হতো। সেই তেল সমবেত সকল মানুষ বিশেষ করে মেয়েরা ও বাচ্চারা বর-কনের মাথায় হাত দিয়ে ঘষে ঘষে তুলে নিয়ে নিজের মাথায় দিত। একবারে সব তেল না ঢেলে দুইবার তিনবারে ঢালা হতো। সমবেত মানুষ হাতে হাতে তেল ঘষে নিয়ে মহানন্দে নিজের মাথায়, বাচ্চার মাথায় মাখিয়ে দিত আর গীত গাইত।

(গীত)

১. ত্যাল রসি ত্যালও আমার বাছার ঘরের ত্যাল
সেই ত্যাল মেখি আমার বাছার বরণ হল কালো
বাপে এসি শুধায়ছি আমার বাছার বরণ ক্যানে কালো
মায়ে উঠি বলিছে আমার ওই বরণ ভালো।

এমন আরও নানা গীত গাওয়া হতো আর হাসি ঠাট্টা চলত তীব্রভাবে। ভাবি সম্বন্ধের মেয়েদের মুখের আগল খুলে যেত। আদিরসাত্মক টিপ্পনীতে আসর মাতিয়ে রাখতো। সেই সঙ্গে দাদি বা নানি' সম্পর্কের মহিলারা আরো বেশি মুখরা হয়ে উঠতো। আনন্দ হাসির বান ডাকতো।

আসলে তখনকার দিনে আজকের মত এত বিনোদনের উপকরণ ছিল না। এখন কি গ্রাম কি শহর সর্বত্রই ছেলে-মেয়েরা নানান বিনোদনের বিষয় নিয়ে মেতে থাকে। ঘরে ঘরে টিভি, রেডিও। হাতে হাতে স্মার্টফোন। নিজেকে বিনোদনে ডুবিয়ে রাখছে সবাই। আর সেকালে এতসব ছিল না। গ্রামের ছেলেরা যদিও বা পঞ্চ রস যাত্রা, মেলায় গিয়ে জাদু খেলা দেখা, পুতুল নাচ দেখা এসব পেত কিংবা বাড়ি থেকে দূরে কোন সিনেমা হলে গিয়ে সিনেমা দেখে আসতো। মেয়েরা এসব কিছু তেমন একটা পেত না। কোন স্বামী তার স্ত্রীকে বা পরিবারের অন্য মহিলাদেরকে সিনেমা দেখাতে নিয়ে গেলে নানান অজুহাত তৈরি করতে হতো। বাড়ির গার্জেনদের নানাভাবে অন্য কথা দিয়ে বোঝাতে হতো, ছলনার আশ্রয় নিতে হতো। একটা সিনেমা দেখতে যাওয়া মানে অনেক হ্যাপা। ধরা পড়ে গেলে বা গার্জেনরা জানতে পারলে তা নিয়ে পরিবারের মধ্যে কলহ তৈরি হতো। তাছাড়া বাড়ির মহিলারা বড় লজ্জা ও বিড়ম্বনায় পড়ে যেত। তাই এ পথে অনেক স্বামী বা পরিবারের পুরুষেরা সাহস করে এগোতে পারত না। তাই গ্রামীণ মহিলাদের বিনোদন বলতে ছিল এইসব সামাজিক অনুষ্ঠান। বিবাহ, ছেলের মুসলমানি বা খৎনা। তারা এই সব অনুষ্ঠানে প্রাণভরে আনন্দ করে নিত। মনের গোপনে লালিত সাধ পূরণ করত। মন খুলে গীত গাইত। এমনি সময় তো আর গান-বাজনা করা হতো না, তাই গান-বাজনা নাচের এই সামাজিক অনুষ্ঠানে প্রাণ ভরে

আনন্দ করে নিতো। বাড়িতে ছেলেমেয়ে বড় হতে শুরু করলে বাড়ির মেয়েরা মনের গোপনে তাদের বিয়ের অনুষ্ঠান নিয়ে নানান স্বপ্ন সাধ আহ্লাদ অনেকদিন ধরে লালন করতো। গৃহবন্দী জীবনে এই সব আচার অনুষ্ঠান ছিল যেন দখিন দুয়ার। একটু হাফ ছেড়ে বাঁচা। একটু যেন বেঁচে থাকার, শ্বাস নেওয়ার অবকাশ। আটপৌরে জীবনের বাইরে একটু অন্যরকম জীবনের স্বাদ খুঁজে নেওয়া।

গায়ে হলুদ এমনি একটি বিবাহের স্ত্রী আচার। বিয়ের তিনদিন আগে থেকেই বর কনের গায়ে হলুদ মাখানো হতো। এই গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানে নানা গীত গাওয়া হতো। তেমনি কিছু গীত হল :

১. হলদি তুমি কোন কোন ঘরে জন্ম
হলদি আমি আল্লা রাসূলের ঘরে জন্ম
হলদি তুমি কার কার গায়ে লাগো
হলদি আমি কন্যার গায়ে লাগি।

২. কন্যা ডাক দেও তোর জননী মাইরে
মাও দিয়ে যাক সোনামুখে হলদি রে হলুদা
ডাক দেও তোর জন্মদাতা বাপরে
বাপ দিয়ে যাক তোর সোনামুখে হলদি রে হলুদা।

৩. যেখুন ছ্যালে আমার ত্যাল হলুদ মাখে
তেখুন ভাবের মেলেনি খুরি ধরি টানে
ছাড়ো ছাড়ো হে মেলেনি আমার মাথার কিরে
শাদী করে বাছা আমার কইন্যা আমারে শুপিবে।

বিয়ের আগের দিন রাতে তেল হলুদ মাখানোর পর বড় থালায় ক্ষীর, বিভিন্ন ফল, মিষ্টান্ন সাজিয়ে বরকে বা কনেকে সেখানে বসানো হতো। এক একজন করে আত্মীয় এসে অল্প একটু একটু করে বর বা কনের মুখে ক্ষীর ফল মিষ্টান্ন তুলে দিত আর টাকা বা জিনিসপত্র উপহার দিত। এই আচার এখনো আছে। এখানেও কিছু কিছু গীত পরিবেশিত হতো। তবে থালা সামনে দেওয়ার আগেই গীতগুলো গাওয়া হতো। যেমন—

১. আলুয়া চালের কাঞ্চন দুধে ক্ষীরোয়া পাকালাম
সেই না ক্ষীরোয়া খেতে বাছার গরমি লেগেছে
কোথায় আছো বড়ভাবি পাংখা হিলাওরে।

মুসলিম পরিবারে নাচ গান বাদ্য নিষিদ্ধ হলেও এ কয়দিন যেন ছাড় থাকতো। তিনদিন ধরে রাতে ঢোল বাজিয়ে নাচ ও গীত হত। পাড়ার বা গ্রামের কিছু মহিলা

থাকতো তারা গীত-নাচে খুব পারদর্শী। কারো বাড়িতে বিয়ে লাগলে তারা এসে হাজির। অনেকে খবর পাঠিয়ে ডেকে আনতো। তারা না এলে যেন আসর জমত না। আমাদের গ্রামে এমনই একজন গীতি গাওয়াতে পারদর্শী মহিলা ছিল কুলসুম। তাকে ডাকতে হতো না। কারো বাড়িতে বিয়ে লেগেছে শুনলে সন্ধ্যাবেলায় চলে আসত। মাঝে রাত পর্যন্ত গীত-নাচ হত। একাই আসর মাত করে রাখত সে। অসংখ্য গীত তার মুখস্ত ছিল। গ্রামের প্রায় সব মেয়েরাই কিছু কিছু গীত মুখস্ত রাখত। ঢোল বাজিয়ে তালে তালে হাতে তালি দিয়ে সুরে সুরে এই গীত গাইতো। মাঝে মাঝে রঙ্গ রসিকতাও চলত। এই সময় সেখানে পুরুষদের যাওয়া নিষেধ। এমন কতগুলো গীত হল—

১. হাইরে পিতলের কলসি
কলসি রে তোর এমনই ধর্ম
মাজিলে ঘসিলে সোনার বর্ণ
তোকে লিয়ে বন্ধুর বাড়ি যাইরে পিতলের কলসি।

২. বর্ধমানের ইসটাসিনে ট্রেন চলে উপর পানে
ঐদা ভাশুর আসছে ত্যাল নিয়ে।

৩. বন কাটিলাম জঙ্গল কাটিলাম বানালাম ময়দানও রে মাহিলা
কোনবা ঘাটে লাগাবো ফুলের লা
আমার যে ঘাটে আল্লাহ-রসুলের গান
সেই ঘাটেতে লাগাবো ফুলের লা।

৪. বাজ বাজে আমার আসমানে
বাজে বাজে আমার পাতালে
বাজে বাজে আমার কেষ্ট কমলার দ্যাশে।
বাপজির দ্যাশের কবিতোর
ওই ঝাঁকে আমি উড়াবো
ওড়াতে ওড়াতে দেখিবো বাপজানের ওই মুখও
বাপজান বড় নিদারুণ আমার লগন লিল কি কারণ।

৫ . কালো কালো কালো হে ডোমেরা
আমার কালো দুটি আঁখি
ভালো করে সাজাও হে শেহেরা
আমার দুলুল ফুলের সাজি।

বিবাহের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন গীত গাওয়া হতো। সেই বিভিন্ন বিবাহ পর্যায় অনেক সময় হয়ে উঠত গীতের বিষয়। যেমন গায়ে হলুদ, টিঁকি মুলানি, ক্ষীর খাওয়ানি,

বরের আগমন, মেয়ে বিদায় প্রভৃতি। বরের আগমনে বরের পোশাক, রূপ নিয়ে গীত গাওয়া হতো। সেদিন বরই হলো শাহেনশা। বরের রূপের বর্ণনা শুনিয়ে কন্যার উদ্দেশ্যে গান গাইত কন্যার মনে পূর্বরাগ সঞ্চারের প্রচেষ্টায়। কেউ কেউ আবার কন্যার রূপের বর্ণনা শুরু করতো। ফলে একই বাড়ির মহিলা দুটো পক্ষে ভাগ হয়ে গিয়ে তরজা শুরু করত। কেউ হার মানতে চাইতো না। আর এই গীতের কিছু কিছু কথা যেমন বাঁধা থাকত তেমনি কিছু কিছু কথা আবার তাৎক্ষণিকভাবে বেঁধে নিয়ে গাওয়া হতো। ফলে নারীদের রচনা ক্ষমতার একটা দারুণ প্রকাশ হিসাবে এই বিবাহ গীত এর কথা বলা যায়।

গানের মধ্যে কখনো বরকে সতর্ক করা হচ্ছে। কন্যা যে কত আদরে মানুষ তা জানিয়ে এই সতর্কবার্তা উচ্চারিত। বাপ মায়ের পক্ষ ধরে গানে গানে মেয়ে যে কত আদরের মানুষ তা বলে বরকে সতর্ক করা। এত আদরের কন্যার যেন কোনো অযত্ন না হয়, যেন কোনো কষ্ট দেওয়া না হয়। ভাবতে অবাক লাগে কি অপূর্ব সাহিত্যরস সমৃদ্ধ এই গানগুলি।

এমন একটি গীত হল বর বিবাহের জন্য কনের বাড়িতে উপস্থিত। বরের সাজ পোশাক নিয়ে একদল বলছে

দুলহান সাজাও আম্মা খুবসুরত করিয়া
দামান আসিছে দেখি পাগড়ি নাড়িয়া

এর সূত্র ধরে কন্যার মা উত্তর দিচ্ছে—

আসুক নারে পুতার দামান চিন্তার নাই কিছু
কামরাঙ্গা রঙ পাটি পিঁধে বেটি যাবে পিছু পিছু

বিবাহের বিভিন্ন পর্যায়ের অনুষঙ্গ ছাড়াও অন্য নানা বিষয় নিয়ে গীত রচিত হত। নারীমনের আনন্দ বেদনা সুখ-দুঃখ ফুটে উঠত এইসব গীতে।

নারীমনের আনন্দ বেদনা সুখ-দুঃখ ফুটে উঠত এইসব গীতে। প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন বিষয়, মাঠ, নদী গাছপালা, ফসল সবকিছু নিয়েই গীত রচিত হত। নারী মনের আনন্দ বেদনার একান্ত প্রকাশ এই গীত। তাই গীতগুলি ছিল প্রাণবন্ত। নারী মনের আনন্দ যন্ত্রনার সুন্দর অভিব্যক্তি এই গীত হওয়ায় সব মেয়েরা সহজেই আপন করে নিতো এবং বছরের পর বছর রাতের পর রাত বিভিন্ন বিবাহ বাড়িতে এই কথাগুলি গেয়ে চলত।

প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন বিষয়, মাঠ, নদী গাছপালা, ফসল সবকিছু নিয়েই গীত রচিত হত। নারী মনের আনন্দ বেদনার একান্ত প্রকাশ এই গীত। তাই গীতগুলি ছিল প্রাণবন্ত। নারী মনের আনন্দ যন্ত্রনার সুন্দর অভিব্যক্তি এই গীত হওয়ায় সব মেয়েরা সহজেই আপন করে নিত এবং বছরের পর বছর রাতের পর রাত বিভিন্ন বিবাহ বাড়িতে এই কথাগুলি গেয়ে চলত।

গীতগুলি যুগ যুগ ধরে মুখে মুখে বয়ে এসেছে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম তারা কণ্ঠে ধারণ করেছে। গীত গাওয়া মজলিসে যেমন বয়স্ক মহিলারা থাকত তেমনি থাকতো কিশোরী বা তার থেকে ছোট বয়সের মেয়েরা। এক প্রজন্ম শেষ হলে আরেক প্রজন্মের গীতের বাহক হতো এই কিশোরীরা। অনেক সময় কোন গীত থেকে কিছু কথা সময়ের আঘাতে হারিয়ে যেত। তার সঙ্গে নতুন কথা যোগ হত। আবার কোন মহিলা একান্ত বসে বিছানা বোনাচ্ছে বা কাঁথা সেলাই করছে। এই করতে করতে গুনগুন করে কোন কথা নিয়ে সুর ভাজতে ভাজতে গীতের জন্ম দিত। এই দু-এক কলি গীত কোন বিয়েবাড়িতে গাওয়া হলে তার সঙ্গে আরো কথা জুড়ে হয়তো পূর্ণাঙ্গ একটা গীত তৈরি হয়ে যেত। এভাবে যুগ থেকে যুগান্তরে এই গীত বয়ে এসেছে। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে এসে এই ধারা হারাতে বসেছে।

নিরক্ষর গ্রাম্য মহিলাদের দ্বারা এই গীত গুলি রচিত হলেও গীতের মধ্যে বিচিত্র শব্দ প্রয়োগ নৈপুণ্য লক্ষ্য করা যায়। গ্রাম্য মহিলারা কি অবলীলায় আরবি-ফারসি তৎসম তদ্ভব আঞ্চলিক শব্দের প্রয়োগ করতো তা ভেবে অবাক হতে হয়। তাদের মধ্যে যেমন সাম্প্রদায়িক বিভেদ চিন্তা ছিল না তেমনি ছিল না শব্দ গ্রহণে ছুতমার্গ। এখানে একটা গীতের কিছু অংশ তুলে ধরলে বোঝা যাবে শব্দগ্রহণে তারা কত দক্ষ ও উদার ছিল—

ওই না উঁচু দালানে বসে হে বাপজান কোরআন পড়িছে
তারি সামনে সামনে হে বিটিজান খেলা পাতালছে
এত না সোহাগের বিটিজান হামারেজান কারে শুপিব
হস্তীর উপর আসছে হে তালুকদার তারে শুপিব।।'

এখানে দালান, বাপজান, কোরআন, বিটিজান, এতনা, সোহাগের, হামারে জান, শুপিব, হস্তী , তালুকদার প্রভৃতি শব্দগুলি বিভিন্ন গোত্রের অথচ কী অবলীলায় তাদের পাশাপাশি বসিয়েছে সেইসব নিরক্ষর গ্রাম্য মহিলারা। তাদের মধ্যে যে এক অসাধারণ সৃষ্টিশীল শিল্পী মন অবস্থান করতো তার প্রমাণ এই সব গীতগুলি। লোকসাহিত্যের এক অপরিসীম ভাণ্ডার এই মুসলিম বিবাহ গীত। এইসব মহামূল্যবান হাজার হাজার সৃষ্টি নষ্ট হয়ে গেছে। কালের গর্ভে আজ বিলীন। অল্প কিছু এখনো বেঁচে আছে তবে সেভাবে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা নেই।

গীতের সঙ্গে সঙ্গে নাচও চলত। অনেকে শখ করে নাচতো। কেউ কেউ নাচার ইচ্ছা থাকলেও লজ্জায় নাচতে উঠতে চাইত না। তখন অনেকে ঠেলে ঠুলে তাকে তুলে দিত। ধরে ঠেলে ঠুলে তুলে দেওয়ার মধ্যেও মজা থাকতো। একবার উঠে নাচতে শুরু করলে আর নাচ থামত না। এই নাচের জন্য গ্রামে কিছু মহিলার খুব সুনাম ছিল। তেমন একজন হল সাজুনানি। এই মহিলা কে আমরা ছোটবেলায় যখন দেখেছিলাম তখনি বেশ বয়স্ক। কিন্তু গীতের ঘরে ঢুকে একবার নাচ শুরু করলে আর থামানো যেত না। জুড়িদার হিসেবে যুবতী মেয়েকে নাচতে তুলে দিলে জুড়িদার যুবতী ক্লান্ত হয়ে বসে পড়তো কিন্তু সাজুনানি নেচেই চলত। প্রাণখোলা মানুষ ছিল সাজুনানি। আসর শেষে পেট ভরে খেয়ে দেয়ে মাঝরাত পার করে বাড়ি ফিরতো। বাড়ি ফিরলে অনেকদিন রাতে মতি নানা বকা দিত। লজ্জা দিয়ে কথা বলত। বলত ছেলে মেয়ের তোমার বিয়ে হয়ে গেছে, নাতি-নাতনি হয়েছে তবু শখ গেল না। ধিংড়ি মেয়েদের মতো নেচে বেড়াও। তোমার লজ্জা করে না। সাজুনানি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতো কিছুক্ষণ। তারপর ফিক করে হেসে বলতো মদিনার বাপ লজ্জা দিওনা গো, তুমি তো জানো এটাই আমার শখ। মনে করি যাব না, গেলেও নাচবো না। কিন্তু ঢোলে বাড়ি পড়লে আমার পা সুড়সুড় করে, বুকের ভেতর নাচনের মাতন ওঠে। নিজেকে সামলাতে পারি না গো।

মতি নানা বহুদিন ধরে দেখে আসছে এই মেয়েকে। কি বলবে, বলার কিছু নাই। জোয়ান বয়সেই আটকাতে পারেনি। তাই একগাল হেসে বলতো, দেখো মদিনার মা যা কর কর যেন এ বয়সে কেলেঙ্কারি করো না। নাচতে গিয়ে পড়ে পা ভেঙ না। হয়তো কোনদিন শুনবো পা ভেঙে কারো বাড়িতে পড়ে আছ। আমাকে গিয়ে ঘাড়ে করে নিয়ে আসতে হচ্ছে। সাজুনানি আবার ফিক করে হেসে বললো, ভালোই তো, বুড়ো বয়সে একবার তোমার ঘাড়ে চড়তে পাব।

এই সাজুনানি কুলসুমদের ভেতর কি কোন শিল্পী বাস করতো? হয়তো করতো। তারা প্রকৃত শিল্পী ছিল। গ্রামীণ শিল্পশৈলীকে তারা রক্তে বহন করত। আর রাতের পর রাত সেই শিল্পী-সত্তাকে অন্যের মধ্যে চালিত করার চেষ্টা চালাত। নিজেদের যথার্থ উত্তরসূরি খুঁজে বেড়াত।

এখন আর গ্রামে এমন শিল্পী মানুষ খুঁজে পাওয়া যায় না। গ্রামীণ শিল্পকর্ম আজ কালের গর্ভে বিলীন হতে বসেছে। এখন আধুনিক চটুল নাচ গান গ্রামের সহজ-সরল চিরাচরিত শিল্পশৈলীকে গ্রাস করেছে। তা যেন আজ সব ব্যাকডেটেড কালচার।

এখন আর বিয়ে বাড়িতে ঢোল বাজিয়ে গীত নাচ হয় না। হলে খুবই কম বাড়িতে হয়। কেউ ঢোল নিয়ে আসলে পুরনো দিনের কিছু মানুষ তা বাজিয়ে গীত গায়। নবীন

প্রজন্ম হাসাহাসি করে। ফলে আসর ঠিক জমে না। এখন প্রায় বাড়িতে বক্স ভাড়া করা হয়। চটুল ভোজপুরি, হিন্দি সিনেমার গান বাজে। বাচ্চা ছেলেমেয়েরা বেতাল ছন্দে হাত-পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে নাচে। কখনো বা তরুণ-তরুণীরাও। আগের দিনের মতো গীতের ঘরের আসরে গভীর রাত পর্যন্ত মা-চাচিদের গীত গাওয়া, নাচা আর হয় না।

এই শতাব্দীর প্রথম দিকেও এসব বেশ একটু ছিল তবে তাতে বিশুদ্ধ গ্রামীণ কালচার ছিল না। তার মধ্যেও ঢুকে পড়েছিল সিনেমার ঢং। গত শতাব্দীতে যে গীত নাচ দেখেছি তা ছিল একেবারে গ্রামীণ মেয়েদের তৈরি। গানের ভাষা সুর সবই নিজস্ব। তার মধ্যে মাটির গন্ধ, নিজেদের দেখা জগৎ, ভাব-ভালোবাসা। দেওর, ননদ ননদাই এর সঙ্গে হাসি ঠাট্টা মজাক। নাচের ছন্দে ছিল নিজস্ব মুদ্রা। পায়ে ঘুঙুর বেঁধে সুন্দর করে কাপড়ে নিজেকে জড়িয়ে এক অদ্ভুত মুদ্রায় নাচত। প্রথমে মুখ ঢেকে শুরু হতো। সারা শরীর মাথায় কাপড় জড়ানো, যেন কলা বৌ। তারপর নাচের তালে তালে উন্মোচিত হোত মুখ। হাতের বিভিন্ন ছোট ছোট মুদ্রা সেইসঙ্গে কোমরের দুলুনি। দেহবল্লরীর ভাঁজ বিভঙ্গ। কোমর থেকে দেহের উপরে ভাগ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে শাঁ করে দু বার ঘুরে নিত। তারপর হাত নেড়ে, মুখের ভঙ্গি করে কোমর দুলিয়ে নাচ চলত। সে ছিল এক নিজস্ব ঘরানা। সেই নিজস্ব ঘরানা এই শতাব্দীর গোঁড়াই কৌলিন্য হারায়। আর একটু ভালো করে বললে বলতে হয় গত শতাব্দীর শেষ থেকে এই নাচ ও গীত তার কৌলিন্য হারাতে থাকে।

গ্রামে তখন একটা দুটো টিভি আসতে শুরু করেছে। পাড়ার মোড়ে ভিডিও হল খোলা হয়েছে। আর কিছু দূরের শহরে তো সিনেমা হল আছেই। তবে আগে মেয়েরা সিনেমা দেখার কথা ভাবতে পারত না। বাড়ির গুরুজনদের লুকিয়ে অনেক কৌশলে সিনেমা দেখতে যেত। কিন্তু গত শতাব্দীর শেষ দিকে এই পারিবারিক নিয়ম শিথিল হয়ে আসে। সিনেমা দেখতে যাওয়াটা খুব একটা নিষিদ্ধ কিছু নয় ভাবা হতে থাকে। ফলে গ্রামীণ মহিলা মহলে তার প্রভাব পড়ে। মনোভূমি গড়ে ওঠে অন্যভাবে। পুরনো গ্রামীণ সংস্কৃতি তার কাছে আর তেমন মূল্য পায় না। মা বয়সি মহিলা বা গ্রামের কিছু নিরক্ষর মহিলা সেই সংস্কৃতি আঁকড়ে পড়ে থাকে। বয়ে বেড়ায়। কিন্তু বেশিদিন বইতে পারে না। সভ্যতার প্রবল ঢেউ সেই সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এখন সেই গ্রামীণ সংস্কৃতির কঙ্কালটা পড়ে আছে। জানিনা আর কতদিন এটুকুই বা টিকে থাকবে।

(ক্রমশ)

শবনম জামান

একটি সুখী দ্বীপ

না কোন জেব্রাক্রসিং নেই আর কোন বিশেষ রাস্তা পার হওয়ার জায়গাও ওটা নয়, কিন্তু তবুও গাড়িটা ঠিক আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল এবং ড্রাইভারটি ইশারায় আমাদেরকে জানালো যেন আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে রাস্তা পার হয়ে যাই। আর শুধু ওই একটি গাড়ি নয় তার পেছনের গাড়ি গুলোও পরপর দাঁড়িয়ে গেল। কেউ কিন্তু ওভারটেক করে এগিয়ে গেল না। আর আমরা দুজন অগত্যা দুজনের মুখ চাওয়া চাওয়ি করে রাস্তা পার হয়ে গেলাম। এখানে অগত্যা আর মুখ চাওয়াচাওয়ি বলার পেছনে অবশ্যই কারণ আছে। এক দিক থেকে দেখতে গেলে তো এটা আমাদের জন্য ভালই হল যে ড্রাইভার নিজে থেকে তার গাড়ি দাঁড় করিয়ে আমাদেরকে বলছে রাস্তা পার হয়ে যেতে। ছুটে রাস্তা পার হতে হল না বা হাত দিয়ে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাস্তা পার হতে হল না, যেটাতে আমরা স্বাভাবিকভাবেই অস্বাভাবিক রকম অভ্যস্ত। কিন্তু এখানেই হলো মজা!! আসলে আমরা তো তখনো ঠিকই করে উঠতে পারিনি যে আসলে আমরা কি করবো? মানে রাস্তার ডান দিক বরাবর হাঁটবো নাকি বাঁ দিক বরাবর! আর তাছাড়া বাঁ দিক বরাবর হাটতে গেলে তো আমাদের অপেক্ষা করতে হতো যতক্ষণ সব গাড়িগুলো পার না হয়ে যাচ্ছে। তাই আমাদের কোন তাড়াও ছিল না! আমরা তো আর জানতাম না যে রাস্তার ধারে, রাস্তার দিকে মুখ করে দাঁড়ানো মানে গাড়ির ড্রাইভারটি এটি ভেবে নেবে যে আমরা রাস্তা পার হব! আর এটাও জানতাম না যে এসব জায়গায় কেউ যদি রাস্তা পার হওয়ার উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে থাকে তবে তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় না। মানে তাকে অপেক্ষা করতে হয় না যে কখন গাড়ি চলাচল থামবে। বরং গাড়ির চালকই অপেক্ষা করে যাতে পথচলতি মানুষটি রাস্তা ভালো ভাবে পার হয়ে যায়।

আসলে অভ্যস্ত নই আমরা তো এভাবে রাস্তা পারাপারে। তবে এখানে একটা কথা বলে রাখি, এই যে কাউকে রাস্তা পার হতে দেখলে গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে যায়, সেটা যতটা না পথচলতি ব্যক্তিকে সম্মান করে করা হয় তার থেকেও বেশি ভয়ে করা হয়ে

থাকে। এইতো! ভাবছেন তো যে কিসের ভয়? মানে একটি মানুষ হেঁটে যাচ্ছে তো সেই মানুষটিকে গাড়ি চালিয়ে যাওয়া মানুষটির কিসের ভয়? গাড়ি দাঁড় না করালে সে কি মারবে না ধরবে? না সে মারবে না, ধরবে না, কিন্তু ওটির থেকেও বড় অস্ত্র তার কাছে আছে সেটি হলো 'sue' করা অর্থাৎ মামলা করা! মানে যদি পথচলতি মানুষটির কোনোভাবে গাড়ির সঙ্গে সামান্য ধাক্কা লেগে যায়, তাহলে সে সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির ড্রাইভারকে সু করার হুমকি দেয়। এই সুয়ের হাত থেকে বাঁচতেই এখানে এই নিয়মটি প্রচলিত আছে।

ক্যারিবিয়ান সাগরে অবস্থিত নেদারল্যান্ডস সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছোট্ট একটি দ্বীপ— আরুবা। আরো দুটি দ্বীপ আছে, যে দুটি এই একই নেদারল্যান্ডস সাম্রাজ্যের অন্তর্গত, সে দুটি হলো কুরাসাও এবং বোনেয়ার। এই তিনটি দ্বীপকে যেহেতু ইংরেজিতে এদের বানান এ, বি এবং সি দিয়ে শুরু তাই এদেরকে একত্রে বলা হয় এবিসি আইল্যান্ড। যদিও এটি ক্যারিবিয়ান সাগরে অবস্থিত তবুও এই দ্বীপ গুলি অন্য ক্যারিবিয়ান দ্বীপ গুলির থেকে আলাদা এবং এই তিনটে দ্বীপ কে কিছু ক্ষেত্রে আবার 'ডাচ ক্যারিবিয়ান' ও বলা হয়। কারণ এগুলি নেদারল্যান্ডসের অন্তর্গত। আর এইটি হলো আরুবা - সেই আরুবা, যেখান থেকে আমার আক্ষরিক অর্থে বিদেশ ভ্রমণের শুরু। শুরুটা যদিও আমার হয়েছিল মিয়ামি থেকে বা তার আগেও মুম্বাই থেকে। যেখান থেকে ফ্লাইটে করে প্রথমে নিউইয়ার্ক বিমানবন্দরে পৌঁছানো এবং সেখান থেকে মিয়ামি বিমানবন্দরে। তার পরে

ক্যারিবিয়ান সাগরে অবস্থিত নেদারল্যান্ডস সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছোট্ট একটি দ্বীপ— আরুবা। আরো দুটি দ্বীপ আছে, যে দুটি এই একই নেদারল্যান্ডস সাম্রাজ্যের অন্তর্গত, সে দুটি হলো কুরাসাও এবং বোনেয়ার। এই তিনটি দ্বীপকে যেহেতু ইংরেজিতে এদের বানান এ, বি এবং সি দিয়ে শুরু তাই এদেরকে একত্রে বলা হয় এবিসি আইল্যান্ড। যদিও এটি ক্যারিবিয়ান সাগরে অবস্থিত তবুও এই দ্বীপ গুলি অন্য ক্যারিবিয়ান দ্বীপ গুলির থেকে আলাদা এবং এই তিনটে দ্বীপ কে কিছু ক্ষেত্রে আবার 'ডাচ ক্যারিবিয়ান' ও বলা হয়। কারণ এগুলি নেদারল্যান্ডসের অন্তর্গত।

সেখান থেকে গাড়িতে করে আমার কর্মক্ষেত্রে। কিন্তু ওটাকে যদিও ঠিক ভ্রমণ বলা যায় না। কারণ ওটা আমি শুধু বিমানে চড়ে এবং গাড়িতে বসে নিজের কাজের জায়গা পর্যন্ত পৌঁছে ছিলাম। কিন্তু এই প্রথম কাজে যোগ দেওয়ার পর থেকে মোটামুটি ১৫ দিনের মাথায় আমি আর আমার এক সহকর্মীনি-দুজনে একসাথে বেরোলাম, খেলাম, ঘুরলাম এই দ্বীপের রাজধানী এবং বৃহত্তম শহর অরেনজেস্টাড-এ। আক্ষরিক অর্থে যাকে 'কমলা শহর' বলা যায়। সময়টা হল ২০১৭-র ডিসেম্বর।

ছোট থেকে আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে থাকার সুবাদে সমুদ্র তো কম দেখিনি! নীল সমুদ্র, সমুদ্র সৈকত, সাদা কাঁচের মতো ঝকঝকে বালি এসব দেখে দেখে চোখ অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তবে এটাও ঠিক যে তাতে করেও সমুদ্রের প্রতি ভালবাসাটা এতটুকুও কমেনি। সে দিক থেকে দেখতে গেলে আরুবা দ্বীপটা এমন কিছু হয়তো আলাদা আকর্ষণ এর বিষয় নয়, তবুও কি জানি কেন যতবার আমি এই দ্বীপটায় এসেছি ততবার মনটা ভালো হয়ে গেছে। জানি না কেন একটা অজানা ভালো লাগা, একটা খুশি খুশি ভাব, এই দ্বীপটার প্রতি আমার মনের এক কোণে লুকিয়ে আছে। আরুবা যাচ্ছি শুনলেই মনটা খুব ভালো হয়ে যায়। সুযোগ পেলেই ১ ঘণ্টার জন্য হলেও এদিক ওদিক থেকে একটু ঘুরে আসি। এর কারণটা হয়ত এই দ্বীপের শান্ত মনোরম পরিবেশ হতে পারে; যদিও মোটামুটিভাবে এখানকার সব দ্বীপগুলোর পরিবেশ প্রায় একই রকমের। অথবা এই ভাললাগার একটি অন্যতম কারণ হলো যেহেতু এক হিসেবে এটা আমার বিদেশ ভ্রমণের হাতে খড়ি তাই জন্যেই হয়তো এ রকম অনুভব হয়। তবে আমার মনে হয় এই সুখী সুখী, খুশি খুশি অনুভব করার প্রধান কারণ হলো একটা অদ্ভুত মিল এই দ্বীপটির তার নিজের আদর্শবানীর সাথে। সার্থক সেই আদর্শবাণীটি হল: 'Aruba-One Happy Island' !!!

সংসদ-সংবাদ—১

ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক অনুদান—২০২১

(১ জানুয়ারি —৩১ ডিসেম্বর)

অলিউল্লাহ সরকার(উত্তর ২৪ পরগনা)—১০০০/-
আইয়ুব আনসারি (বোলপুর, বীরভূম) : ১০০০/-
আকতার হোসেন (ইংলিশ বাজার, মালদা) : ১০০০/-
আজিজ লস্কর (সংগ্রামপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা) : ১০০০/-
আজিজুল হক (মুর্শিদাবাদ) : ১০০০/-
আনসারুল হক (হুগলি) : ১৫০০০/-
আনোয়ার এ মুর্শিদ : ১০০০/-
আনোয়ার সাদাত হালদার (হুগলি) : ২৫০০০/-
আব্দুল বারি (বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ) : ১৫০০/-
আব্দুল মান্নান (কলকাতা) : ১০০০/
আবদুল হাদি (কলকাতা) : ২০০০/-
আবদুস সালাম (মালদা): ১০০০/-
আবু বক্কর : ১০০০/-
আবুল কালাম (দেগঙ্গা, উত্তর ২৪ পরগনা) : ১০০০/-
আমজাদ হোসেন (কলকাতা) : ২০০০০/-
আমিনা খাতুন (আলীগড়): ১০০০০/-
আমীরুল ইসলাম (দুর্গাপুর, পশ্চিম বর্ধমান) : ৩০০০/-
আল আমীন মিশন : ২০০০০/- (বিজ্ঞাপন বাবদ)
আলাউদ্দিন (বর্ধমান) : ৪০০০/-
আলিমুজ্জমান (বহরমপুর) : ২১, ০০১/-
আশরাফুল সেখ (কলকাতা) : ১০০০/-
আসলিম সেখ (মুর্শিদাবাদ) : ৪০০০/-
আহমেদ সাকির (উত্তর ২৪ পরগনা) : ১০০০/-
ইকবাল হোসেন (ভগবানগোলা, মুশির্দাবাদ) : ১০০০/-

ইসমত খাতুন (মালদা)—১০০০/-
ইসমাইল দরবেশ (হাওড়া) : ১০০০০/- (যাকাত)
ওয়াসিফ আলি (কাসিমনগর, বীরভূম)—১০০০/-
কলিমউল্লাহ (উত্তর ২৪ পরগনা) : ৩০০০/-
কাজী তাজউদ্দিন (কলকাতা) : ৫০০/-
কারিমুল চৌধুরী (বর্ধমান) : ১০০০/-
গোলাম মুর্ত্তজা (বোলপুর, বীরভূম) : ১৫০০/-
জামিলুর রহমান (দিল্লি) : ৩৫০০/-
জার্জিস হোসেন (ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ) : ১০০০/-
জাহির আব্বাস (বর্ধমান) : ৭০০০/-
জিকরাউল হক (মুর্শিদাবাদ) : ১০০০
জুলফিকার আলি (চাঁচল, মালদা) : ১০০০/-
নজরুল ইসলাম (বহরমপুর) : ৫০০০/-
নাজমা নারগিস (কলকাতা) : ২০০০/-
নারগিস সুলতানা (মুর্শিদাবাদ) : ১০০০/-
ফজলে কিবরিয়া(কলকাতা) : ১০০০/-
ফরিদ হোসেন (দক্ষিণ ২৪ পরগনা) : ১০০০/-
ফারাহানা ইয়াসমিন (উত্তর ২৪ পরগনা) : ৪০০০/-
বন্দনা সাহা : ১০০/-
মসিউর রহমান (রজারহাট, উত্তর ২৪ পরগনা) : ৪০০০/-
মিনসারুল হক (মালদা) : ৫০০/-
মিনারুল ইসলাম (মুর্শিদাবাদ) : ১৫০০
মীরাজুল ইসলাম (দক্ষিণ দিনাজপুর) : ৫০০০/-
মীর রেজাউল করিম (কলকাতা) : ৫০০০/-
মুজতবা হাসান (বীরভূম) : ৫০০/-
মুহম্মদ হাবিব (কলকাতা) : ৫০০০/-
মুহাম্মদ আফসার আলী (বারাসাত) : ৭১০০/-
মোহঃ- ইব্রাহিম (মালদা) : ১৫০০/-
মোহঃ আসরাফ আলি (ভগবানগোলা) : ১০০০/-
মোহ ঃ উমর (বারুইপুর) ৬০০০/ (যাকাত)
মোহঃ সেলিম (বসিরহাট) : ৬০০০/-
রবিউল ইসলাম : ৫০০০/-
রমজান আলি : ১০০০/-

সাইফুল সেখ (নদীয়া) : ৫০০০/-
সাইফুল্লা (উত্তর ২৪ পরগনা) : ২৫০০০/-
সাজ্জাদ গাজী (বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগনা): ১০০০/-
সাদেরুল আমিন (ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ) : ৪০০০/-
মুহম্মদ সামাউন : ১০০০/-
সাবানা পারভীন (মুর্শিদাবাদ) : ২০০০/-
সাবানা রহমান (বারাসাত) : ৪০০০/-
সাবির মণ্ডল (বারাসাত) :১০০০/-
সাবিলা খাতুন(মুর্শিদাবাদ) : ৫০০০/-
সামসুল আলম (ডোমকল) : ৫০০০/-
সামসুল হালসানা (বরহমপুর) : ৫০০০/-
সামিম হায়দার : ৫০০/-
সুখবিলাস বর্মা (কলকাতা) : ১০০০/-
সেখ কামাল উদ্দীন (বারাসাত) : ৫০০০/-
সেলিম রেজা (সাগর দিঘি) :১০০০/-
স্বপন পাণ্ডা (কলকাতা) : ১০০০/-
হাকিমুর রশিদ : ১০০০/-

যাঁরা অর্থ সাহায্য করেছেন এবং আগামী দিনে করবেন তাঁদের সকলকে আলিয়া সংস্কৃতি সংসদ এর পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি। উপস্থাপিত হিসাবে কোথাও কোনো গরমিল লক্ষ করলে অবিলম্বে তা আমাদের অবগত করে অনুগ্রহ করুন। ৯৪৩২৮৮০২৪২, ৮৬৩৭০৮৬৪৬৯

মীর রেজাউল করিম
কোষাধ্যক্ষ, আলিয়া সংস্কৃতি সংসদ

আমাদের পথচলা

আলিয়া সংস্কৃতি সংসদ পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সমাজের সাংস্কৃতিক জাগরণের লক্ষ্যে পরিকল্পিত ও প্রতিষ্ঠিত একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। ২০১৮ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু হয় এই প্রতিষ্ঠানের। সূচনা থেকে অদ্যাবধি (৩১ ডিসেম্বর ২০২১) প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রেক্ষিতে যা কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তার রূপরেখা নিম্নরূপ :

উৎসব-অনুষ্ঠান

১। ১৫ এপ্রিল ২০১৯—বৈশাখী ১৪২৬। ওরিয়েন্টাল মিডিয়া ফোরাম এর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে। দুই পর্বে বিন্যস্ত এই সভায় সদ্য প্রয়াত সাহিত্যিক নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, আবদুর রাকিব, আফসার আমেদ, সোহারাব হোসেন ও ওয়ালে মহম্মদ এর জীবন এবং কৃতির উপর আলোকপাত করা হয়; সঙ্গে ছিল বাংলা নববর্ষের প্রেক্ষিতে বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গ।

২। ২৩ ডিসেম্বর ২০১৮—এষণা ২০১৮। ওরিয়েন্টাল মিডিয়া ফোরাম এর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে। অনুষ্ঠানটি ছিল বহুমাত্রিক। বিশেষ আয়োজন হিসাবে ছিল আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, মাওলানা আকরম খাঁ ও স্যার সৈয়দ আহমেদ কেন্দ্রিক পৃথক পৃথক বক্তৃতা; কথাকার নজরুল ও সম্পাদক নজরুল বিষযক আলোচনা; এবং মুজিবর রহমান নির্মিত 'নজরুল জীবন পরিক্রমা' শীর্ষক তথ্যচিত্র প্রদর্শন।

৩। ৮ ডিসেম্বর ২০১৯—বই প্রকাশ ও আলোচনা সভা। প্রকাশনা সংস্থা বুকস স্পেস এর সঙ্গে যৌথভাবে। উপস্থিত ছিলেন বারিদবরণ ঘোষ, আবদুর রাউফ, মীরাতুন নাহার, জাহিরুল হাসান, সুমিতা দাস সহ সংস্কৃতি জগতের বহু বিদগ্ধ ব্যক্তিত্ব। এই সভায় দুটি বই আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশিত হয়। ১। সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমান সমাজ—স্বপন বসু (সংকলিত ও সম্পাদিত), বুকস স্পেস; ২। প্রাক্ সাতচল্লিশ পর্বে বাঙালি মুসলমান মেয়েদের সাহিত্যচর্চা (১-৪ খণ্ড)—সাইফুল্লা এবং কামরুল হাসান (সংকলিত ও সম্পাদিত), বুকস স্পেস।

৪। ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২১—উজ্জীবন ২০২১। দিনটির নিজস্ব প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসীয় বিশেষ বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক সুরঞ্জন মিদ্দে। সংসদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাপেক্ষে আয়োজন করা হয় 'ইসমাইল হোসেন সিরাজী স্মারক বক্তৃতা'র। সমাজেতিহাসবিদ খাজিম আহমেদ স্মারক বক্তা হিসাবে 'পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি মুসলমান সমাজে সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার ধারা' বিষয়ে তাঁর বীক্ষণ উপস্থাপন করেন। সভার বিশেষ অধ্যায় ছিল শহীদুল্লাহ পুরস্কার, রোকেয়া পুরস্কার ও মশাররফ পুরস্কার প্রদান।

৫। ৯ মে ২০২১—রবীন্দ্র জয়ন্তী উদ্‌যাপন ।

৬। ২৬ মে ২০২১—নজরুল জয়ন্তী উদ্‌যাপন।

সাহিত্য-সংস্কৃতিবাসর

১। ৫ আগস্ট ২০২০ : পর্ব-১. জীবনানন্দের কবিতা পাঠ ও আলোচনা—জহর সেন মজুমদার। পর্ব-২. উদীয়মান কবিদের কবিতা পাঠ ও তাঁদের আত্মকথন।

২। ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ : পর্ব-১. নিশীথ ভড়ের কবিতা পাঠ ও আলোচনা—প্রসূন মজুমদার। পর্ব-২. উদীয়মান কবিদের কবিতা পাঠ ও তাঁদের আত্মকথন।

৩। ৩ অক্টোবর ২০২০ : পর্ব-১. বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এর কবিতা পাঠ ও আলোচনা—জহর সেন মজুমদার। পর্ব-২. উদীয়মান কবিদের কবিতা পাঠ ও তাঁদের আত্মকথন।

৪। ৭ নভেম্বর ২০২০: পর্ব-১. গল্পের জায়গা জমি মানুষ ও হাসান আজিজুল হক—বরেন্দু মণ্ডল। পর্ব-২. গল্পকার আমিনুর রাজ্জাক দফাদার এর গল্পপাঠ ও তাঁর আত্মকথন।

৫। ১৯ ডিসেম্বর ২০২০: পর্ব-১. কবি নজরুল—রমজান আলি। পর্ব-২. বিশিষ্ট সাহিত্যিক একরাম আলির কবিতা পাঠ ও কবি-কথন।

৬। ২ জানুয়ারি ২০২১: পর্ব-১. বাংলা ছোটোগল্প : কিছু প্রশ্ন। পর্ব-২. গল্পকার মুসা আলি-র গল্পপাঠ ও তাঁর আত্মকথন।

৭। ১৬ জানুয়ারি ২০২১: পর্ব-১. ছোটোগল্পকার জীবনানন্দ—সোমা ভদ্র রায়। পর্ব-২. কথাকার কামাল হোসেন এর গল্পপাঠ ও তাঁর আত্মকথন।

৮। ৩০ জানুয়ারি ২০২১: পর্ব-১. সিলেটি নাগরি লিপি ও বাংলা সাহিত্য—মুহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম। পর্ব-২. বিশিষ্ট সাহিত্যিক রক্তিম ইসলামের আত্মকথন।

৯। ২৭ মার্চ ২০২১: পর্ব-১. ঔপন্যাসিক আবদুল আজিজ আল্‌-আমান—সেক আপতার হোসেন। পর্ব-২. বিশিষ্ট সাহিত্যিক ইসমাইল দরবেশের আত্মকথন।

১০। ১১ সেপ্টেম্বর ২০২১: পর্ব-১. মানবী চেতনা ও বাংলা কবিতা—বাসবী চক্রবর্তী। পর্ব-২. উদীয়মান সাহিত্যিক আব্দুল বারী-র সঙ্গে পরিচয়ের সিঁড়িভাঙা।

স্মারক বক্তৃতা

১। ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১। মহাশ্বেতা দেবী স্মারক বক্তৃতা। আমাদের কথা, আমাদের কথাসাহিত্য—রামকুমার মুখোপাধ্যায়।

২। ৩ এপ্রিল ২০২১। বিসমিল-আসফাকউল্লাহ স্মারক বক্তৃতা। প্রাগ্‌ভাষ—শঙ্কর ঘোষ। ভগৎ সিং-এর মনন বিশ্ব : ধারাবাহিকতা ও উত্তরণ—কণিষ্ক চৌধুরী।

৩। ৫ জুন ২০২১। আব্বাসউদ্দীন স্মারক বক্তৃতা। প্রাগ্‌ভাষ—সুখবিলাস বর্মা, মিউজিক থেরাপী—সুজিতকুমার পাল। বি দ্র : যান্ত্রিক কারণে অধ্যাপক সুজিতকুমার পাল তাঁর কথা বলতে পারেননি। এই অবস্থায় সুখবিলাস বর্মা আব্বাসউদ্দীন ও তাঁর গান নিয়ে বিস্তৃত পরিসরে আলোচনা করেন।

৪। ১২ জুন ২০২১। সুখময় মুখোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা। প্রাগ্‌ভাষ—জ্যোৎস্না চট্টোপাধ্যায়। কবি কর্ণপূরের চৈতন্য-কথন ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা—নিরুপম আচার্য।

৫। ২৬ জুন ২০২১। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন স্মারক বক্তৃতা। প্রাগ্‌ভাষ—মীর রেজাউল করিম। সংবাদ-সাময়িকপত্রের অঙ্গনে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি মুসলমান সমাজের পদধ্বনি (১৯৪৭-১৯৯৯)—খাজিম আহমেদ।

৬। ৩ জুলাই ২০২১। গিরিশচন্দ্র ঘোষ স্মারক বক্তৃতা। প্রাগ্‌ভাষ—অপূর্ব দে। উনিশ শতকে বাঙালির নাট্যসংস্কৃতি—রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৭। ১০ জুলাই ২০২১। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ স্মারক বক্তৃতা। প্রাগ্‌ভাষ—সাইফুল্লা। বাংলা সাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলাম এবং—শেখ কামাল উদ্দীন।

৮। ১৭ জুলাই ২০২১। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি স্মারক বক্তৃতা। প্রাগ্‌ভাষ—কণিষ্ক চৌধুরী। বাংলা ভাষার জন্য আজকের বাঙালির করণীয়—পবিত্র সরকার।

৯। ২৪ জুলাই ২০২১। স্যার সৈয়দ আহমেদ স্মারক বক্তৃতা। প্রাগ্‌ভাষ—মানস দত্ত। আল-আমীন মিশন : চলার পথ ও পাথেয়—এম নুরুল ইসলাম।

১০। ৩১ জুলাই ২০২১। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্মারক বক্তৃতা। প্রাগ্‌ভাষ—মীর রেজাউল করিম। উত্তর পূর্ব ভারতের বাঙালি সমাজ : অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ—তপোধীর ভট্টাচার্য।

১১। ৭ আগস্ট ২০২১। কবি কায়কোবাদ স্মারক বক্তৃতা। প্রাগ্‌ভাষ—আবু সায়েদ আহমেদ। প্রাগাধুনিক পর্বে বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে সাংস্কৃতিক সমন্বয়—সা'আদুল ইসলাম।

১২। ১৪ আগস্ট ২০২১। দেবেশ রায় স্মারক বক্তৃতা। প্রাগ্‌ভাষ—স্বপন পাণ্ডা। কথাকার আফসার আমেদ : অন্বেষণ; প্রতীতি—পাতাউর জামান।

১৩। ২১ আগস্ট ২০২১। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ স্মারক বক্তৃতা। প্রাগ্‌ভাষ—আমজাদ হোসেন। সংস্কৃতির চলমানতা : প্রেক্ষিত বঙ্গ-আসাম—অমলেন্দু চক্রবর্তী।

১৪। ৪ সেপ্টেম্বর ২০২১। বাবাসাহেব আম্বেদকর স্মারক বক্তৃতা। প্রাগ্‌ভাষ—নীতিশ বিশ্বাস। সংখ্যাগরিষ্ঠের গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ অনুন্নত সমাজ : উত্তরণের উপায়—মুহম্মদ আফসার আলি।

আলোচনা সভা

১। ২-৪ আগস্ট ২০২০ (তিন দিন)। বাংলায় হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক। প্রাক্ উনিশ শতক—মীর রেজাউল করিম; উনিশ শতক—অমিত দে; উত্তর উনিশ শতক—মিলন দত্ত।

২। ১৫ আগস্ট ২০২০। স্বাধীনতার সাত দশক; ফিরে দেখা। স্বাধীনতার সাত দশকে সমাজেতিহাসের ভাঙাগড়া—অমিত দে; স্বাধীনতার সাত দশকে রাজনৈতিক মূল্যবোধের সমীকরণ---মইনুল হাসান; স্বাধীনতার সাত দশকে ভারতের অর্থনৈতিক চালচিত্র—নিলয়কুমার সাহা।

৩। ২৮ আগস্ট ২০২০। বহুমাত্রিক নজরুল—মুজিবর রহমান।

৪। ১২ সেপ্টেম্বর ২০২০। দেশভাগ ও মাওলানা আবুল কালাম আজাদ—মহম্মদ শাহনুরুর রহমান।

৫। ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২০। দেলওয়ার হোসেন আহমেদ মির্জা (১৮৪০-১৯১৩) : সমাজভাবনার পুনঃপাঠ—আমজাদ হোসেন।

৬। ১০ অক্টোবর ২০২০। সুকুমারী ভট্টাচার্যকে যেমন দেখেছি—শাহযাদ ফিরদাউস।

৭। ১২ ডিসেম্বর ২০২০। বাংলা ভাষা : ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার—সাইফুল্লা।

৮। ২৬ ডিসেম্বর ২০২০। মাওলানা ভাসানী : বিকল্প রাজনৈতিক ভাবনা প্রসঙ্গ—সৌমিত্র দস্তিদার।

৯। ৯ জানুয়ারি ২০২১। সমন্বয়ের ঐতিহ্য—ইমানুল হক।

১০। ২৩ জানুয়ারি ২০২১। ইসলাম ও ভারতীয় সংস্কৃতি—সিরাজুল ইসলাম।

১১। ৬ ফ্রেবুয়ারি ২০২১। বন্ধনহীন গ্রন্থিপ্রিয়া : মানবী-বীক্ষণ—মীরাতুন নাহার।

দ*) ৬ মার্চ ২০২১। আকাশ-উড়ানে রবীন্দ্রনাথ—সুদীপ বসু।

*) ১৩ মার্চ ২০২১। ভারতীয় ধর্মচেতনার পরম্পরা; পর্ব-১ : প্রাক্ আর্য-জৈন-বৌদ্ধ। আলোচক—শামিম আহমেদ, দীপঙ্কর কৈবর্ত্ত্য, ডালিম শেখ; সভামুখ্য—অভীক ব্যানার্জী।

১১। ২০ মার্চ ২০২১। নতুন শিক্ষানীতি ২০২০—ইমানুল হক।

১২। ১০ এপ্রিল ২০২১। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি মুসলমান সমাজ : কৃতি ও করণীয়-র সীমারেখা—সাইফুল্লা।

১৩। ২২ মে ২০২১। তালাশনামা : অনুভব ও প্রতীতি। আলোচনায় : সা'আদুল ইসলাম, বর্ণালী ঘোষ, উজাইর সিদ্দিকি, সুবিদ আবদুল্লাহ, সাবিয়া খাতুন, খালিদা খানম।

১৪। ২৫ সেপ্টম্বর ২০২১। আফগানিস্থান আমাদের বীক্ষণ। আলোচনায়—সনৎ কর, মুহম্মদ আফসার আলি, রুহুল কুদ্দুস, বর্ণালী মুখার্জী।

১৫। ৯ অক্টোবর ২০২১। সমাজতত্ত্বের দ্বান্দ্বিকতা ও একালের বাংলা সাহিত্য—সেক আপতার হোসেন।

১৬। ৬ নভেম্বর ২০২১। মিশনারি ও উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ—সুরঞ্জন মিদ্দে।

১৭। ১৩ নভেম্বর ২০২১। কবিতা ও কবির দায়বদ্ধতা—মোস্তাক আহমেদ।

১৮। ২০ নভেম্বর ২০২১। বিকল্প সমাজের সন্ধানে—জ্যোর্তিময় গোস্বামী।

১৯। ২৭ নভেম্বর ২০২১। জালালুদ্দিন রুমির সৃষ্টি দর্শন—মুহাম্মদ শাহ জালাল
২০। ৪ ডিসেম্বর ২০২১। সাতচল্লিশের দেশভাগ ও মুসলমানদের মন—খাজিম আহমেদ
২১। ৫ ডিসেম্বর ২০২১। মওলানা ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দী পরিবার বিষয়ক বিশেষ আলোচনা সভা। আলোচক—সৌমিত্র দস্তিদার ও নজরুল ইসলাম। বহরমপুর।
২২। ১১ ডিসেম্বর ২০২১। বাংলা নাটকে স্বদেশচেতনা: ঔপনিবেশিক পর্ব—মুহম্মদ আলমগীর।
২৩। ১৮ ডিসেম্বর ২০২১। বি এস এফ এর নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকার সম্প্রসারণ। আলাপচারিতায়—ক্রিটি রায়, মইনুল হাসান, অজিত রায়, ইমানুল হক, সুমিতা দাস।

স্মরণ অনুষ্ঠান

১। ২৯ মে ২০২১, গোলাম আহমাদ মোর্তজা, বিশিষ্ট চিন্তক
২। ২২ জুন ২০২১, তাজউদ্দিন আহমেদ, আঞ্চলিক ইতিহাসবিদ
৩। ১ জুলাই ২০২১—আজহারউদ্দীন খান, প্রখ্যাত গবেষক
৪। ১১ জুলাই ২০২১—এবাদুল হক, আবার এসেছি ফিরে-র সম্পাদক
৫। ১৬ জুন ২০২১—বিকাশ রায়, অধ্যাপক
৬। ২৩ অক্টোবর২০২১—চৌধুরী আতিকুর রহমান, ইতিহাসবিদ

বি দ্র : ১৫ এপ্রিল ২০১৯—বৈশাখী ১৪২৬, ৮ ডিসেম্বর ২০১৯—এষণা ২০১৮, ৮ ডিসেম্বর ২০১৯—বই প্রকাশ এবং ৫ ডিসেম্বর ২০২১ এ সম্পন্ন সোহরাওয়ার্দি পরিবার ও মাওলানা ভাসানি বিষয়ক আলোচনা সভা ব্যতিরেক আর সবই অনুষ্ঠিত হয়েছে অনলাইনে। এর প্রত্যেকটির ইউটিউব লিঙ্ক আমাদের কাছে রয়েছে। আমরা তা প্রয়োজনমত সরবরাহ করতে আগ্রহী। যোগাযোগ : ৮৬৩৭০৮৬৪৬৯

পত্রিকা সম্পাদনা

আলিয়া সংস্কৃতি সংসদের মুখপত্র আলিয়া পত্রিকা। সূচনায় পত্রিকাটি ছিল ত্রৈমাসিক। পরে ২০২০ মার্চ থেকে এটি মাসিক হয়। তারও পরে অনিবার্য কারণে আলিয়া-র নাম পরিবর্তন করে করা হয় উজ্জীবন। উল্লেখ্য কোভিদ-১৯ এর সাপেক্ষে আলিয়া-র কয়েকটি পাক্ষিক সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছিল। পাক্ষিক আলিয়া-র সাধারণ সংখ্যায় স্বল্প দৈর্ঘ্যের আটটি করে নিবন্ধ মুদ্রিত হয়। দেশভাগ ফিরে দেখা বিষয়ক একটি বিশেষ সংখ্যায় নিবন্ধের সংখ্যা বেশি ছিল। এন আর সি ও সি সি এ আন্দোলন, কোভিদ-১৯ এসব নানা কারণে আলিয়া বা উজ্জীবন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়নি। অদ্যাবধি আলিয়া বা উজ্জীবন এর প্রকাশিত রূপের পরিসংখ্যান এইরকম :

ক) আলিয়া (ত্রৈমাসিক) : জানুয়ারি ২০১৮, এপ্রিল ২০১৮, জুলাই ২০১৮, অক্টোবর ২০১৮, মার্চ ২০১৯, জুন ২০১৯।

খ) আলিয়া (মাসিক) : মার্চ ২০২০, আগস্ট ২০২০, সেপ্টেম্বর ২০২০, অক্টোবর ২০২০।
গ) আলিয়া (পাক্ষিক) : জুন, জুলাই, আগস্ট ও অক্টোবর মাসে যথাক্রমে দুটি করে সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সেপ্টেম্বর মাসে কোনো সংখ্যা প্রকাশিত হয়নি।
ঘ) উজ্জীবন (মাসিক) : জুন ২০২১, সেপ্টেম্বর ২০২১।

(ত্রৈমাসিক আলিয়া মুদ্রিত রূপে প্রকাশিত হয়। মাসিক আলিয়া মার্চ সংখ্যাও মুদ্রিত হয়েছিল। পরে উজ্জীবন সেপ্টেম্বর সংখ্যা নতুন করে মুদ্রণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট সবই সফ্টকপি বা অনলাইন ভিত্তিক।)

প্রকাশনা

১। সোহরাওয়ার্দি পরিবার—আলিমুজ্জমান (প্রকাশিত)
২। নুরুন্নেছা খাতুন রচনা সংগ্রহ (প্রকাশের পথে)
৩। চরিতাভিধান প্রেক্ষিত বাংলার মুসলমান সমাজ (প্রকাশের পথে)
৪। বাঙালি মুসলিম মনীষা গ্রন্থমালা—মুহম্মদ নাসিরউদ্দিন, মুজিবর রহমান, শাহাদাত হোসেন, ফয়জন্নেছা চৌধুরাণী, মাওলানা ভাসানী (প্রকাশের পথে)
৫। ওয়ালে মহম্মদ রচনা সংগ্রহ (প্রকাশের পথে)
৬। লুৎফার রহমান রচনা সংগ্রহ (প্রকাশের পথে)
৭। মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলি রচনা সংগ্রহ (প্রকাশের পথে)
৮। চরিতাভিধান প্রেক্ষিত ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমান সমাজ (প্রকাশের পথে)
৯। হুমায়ুন কবীর রচনাবলী (পরিকল্পিত)
১০। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ রচনাবলী (পরিকল্পিত)
১১। নির্বাচিত মাসিক মোহাম্মদী (পরিকল্পিত)

পুরস্কার প্রদান

২০২১ সালে শহীদুল্লাহ পুরস্কার, মশাররফ পুরস্কার ও রোকেয়া পুরস্কার-এর প্রচলন করা হয়েছে। পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন—স্বপন বসু (শহীদুল্লাহ পুরস্কার), কামাল হোসেন (মশাররফ পুরস্কার) ও চিত্ররেখা গুপ্ত (রোকেয়া পুরস্কার)।

সংবর্ধনা জ্ঞাপন

১। এমদাদুল হক নূর, সম্পাদক, সাপ্তাহিক নতুন গতি, 'এষণা ২০১৮', ২৩ ডিসেম্বর ২০১৮
২। শেখ কামাল উদ্দিন, সভাপতি, নজরুলচর্চা কেন্দ্র বারাসাত, 'এষণা ২০১৮' ২৩ ডিসেম্বর ২০১৮
৩। আবদুর রাউফ, সম্পাদক, চতুরঙ্গ, ২ অক্টোবর ২০২১

সামাজিক গবেষণা

১। উত্তর সাতচল্লিশ পর্বে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি মুসলমান সমাজের অবদান। (কাজ চলছে)

২। ছেচল্লিশ ও চৌষট্টির সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং এপার বাংলার মুসলমান সমাজের সামাজিক অবস্থান। (পরিকল্পিত)

ডকুমেন্টারি

১। পশ্চিমবঙ্গের সরকারি পোষিত মাদ্রাসা শিক্ষার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিষয়ক। (কাজ চলছে)

২। এরাজ্যে বেসরকারি মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা ও তার সামাজিক অভিঘাত। (পরিকল্পিত)

বর্তমান কার্যনির্বাহক সমিতি

সভাপতি : আজমাদ হোসেন

সহ সভাপতি : মইনুল হাসান, অলিউল্লাহ সরকার

সম্পাদক : সাইফুল্লা

সহ সম্পাদক : রমজান আলি, সেখ আনসারুল ইসলাম

কোষাধ্যক্ষ : মীর রেজাউল করিম

আহ্বায়ক : হাকিমুর রশিদ

সদস্য : আজিজার রহমান, আনোয়ার সাদাত হালদার, আবু হান্নান গাজী, আমিনা খাতুন, মুহম্মদ আফসার আলি, আসরফি খাতুন, আলিমুজ্জমান, একরামুল হক সেখ, জাহির আব্বাস, ফারুক আহমেদ, মফিজুর রহমান, মুসা আলি, রবিউল ইসলাম, সামশুল হক, শেখ কামাল উদ্দিন, শেখ হাফিজুর রহমান